বিজ্ঞানের আলোকে

কোরআন সুন্নাহ

ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন-সুন্নাহ

ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
বিভাগীয় সম্পাদক
ইসলামি ভুবন, স্বাস্থ্য পরামর্শ ও ব্যবসা-বাণিজ্য
বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা

কাসেমিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার্স কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন-সুন্নাহ

ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকাশক :

দ্বীন মুহাম্মদ

কাসেমিয়া লাইব্রেরী

বাংলাবাজার বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার্স কমপ্লেক্স

৪৫, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

[স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ :

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

কম্পিউটার কম্পোজ :

এস. টি. কম্পিউটার

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (৪র্থ তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ :

আল মানার প্রেস

মূল্য : ৭০.০০ টাকা

BIGYANER ALOKE QURAN-SUNNAH BY DR. MOHAMMAD SIDDIQUR RAHMAN. PUBLISHED BY DIN MOHAMMAD QUASEMIA LIBRARY, 45 BANGLABAZAR, DHAKA - 1100

PRICE : TAKA 70·00 ONLY

ভূমিকা

লেখালেখি আমার পেশা নয়, নেশা। আর এ নেশাই আমাকে টেনে নিয়ে গেছে সাংবাদিকতার জগতে। ফলে এখন আমাকে বাধ্য হয়েই লিখতে হয়। লিখতে হয় বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন বিষয়ে। এসবের মাঝে ইসলাম সম্পর্কিত লেখার সংখ্যা মোটামুটি কম নয়। সীমিত জ্ঞান ও সীমিত পড়াশোনা থেকে উৎসারিত ইসলাম বিষয়ক পর্যাপ্ত লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই ছেপেছে। কোন কোন লেখা একাধিক পত্রিকাও ছেপেছে। এসব লেখার জন্য পাবনা জেলা সাহিত্য পরিষদ 'সাহিত্য ভূষণ' খেতাবে সম্মানিত করেছে, কিশোরগঞ্জ সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য পদক, অর্থনৈতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পত্র প্রদান করেছে, বাংলাবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্মানসূচক সনদ প্রদান করেছেন। তাছাড়া অনেক পাঠক পত্রিকায় বা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চিঠি লিখে এ ধরনের প্রবন্ধ আরো বেশি করে লেখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। এদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পত্রিকায় ছাপা ইসলাম বিষয়ক কিছু প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করার আগ্রহ দেখিয়ে দেশের বৃহত্তম পুস্তক বাজার বাংলাবাজারের কাসেমিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার পরম বন্ধু মাওলানা মুজিবুর রহমান সংকলনটি প্রকাশ করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে আমায় ধন্য করেছেন।

পাঠকদের কাছে এসব প্রবন্ধে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে দয়া করে জানালে সবিনয়ে তা গ্রহণ করে আমি সংশোধনের চেষ্টা চালাব ইনশাআল্লাহ। অন্যথায় লেখাগুলো পাঠকদের জন্যে কোন উপকারের উপকরণ হলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব।

বিনীত–

২৯৫/এ/২, টালি অফিস রোড
রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯

ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
তাং ০১-০৯-৯৯ ইং

সূচীপত্র

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ওজু

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

তোমাদের মুখ এবং তোমাদের হাত কনূই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাছেহ কর এবং টুগিনু পর্যন্ত পা ধৌত কর।

'ইবাদত' আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। আর ইবাদতের পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাহারাত বা পবিত্রতা। পবিত্রতা লাভ করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে 'ওজু'।

নর-নারী নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানকে বাধ্যতামূলকভাবে দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। নামাজ মুমিনের জন্য মেরাজ অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ হয়। যে আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দা 'মানুষ' নামাজের মাধ্যমে আন্তরিক সাক্ষাত করে সেই মহান আল্লাহ পবিত্র। আর তাই মানুষকেও পবিত্র হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে গমন করতে হয়। নামাজের পূর্বে সম্পাদিত ওজু সে পবিত্রতা এনে দেয়। তাই প্রতিটি মুসলমান পাঁচবার নামাজ পড়ার পূর্বে ওজু করে পবিত্র হয়ে নেয়। নামাজ ছাড়াও অন্য অনেক ইবাদত আছে যার জন্য ওজু করা আবশ্যক হয়। পাক বা খাঁটি পানির সাহায্যে নির্দিষ্ট নিয়মে শরীরের নির্দিষ্ট কতকগুলো অঙ্গ ধৌত করার নামই ওজু। ওজুর মধ্যে চারটি ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য কার্য আছে। এগুলো হচ্ছে ১. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা। ২. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। ৩. মাথার এক চতুর্থাংশ মছেহ করা। ৪. দুই পা গোড়ালীসহ ধৌত করা। ওজুতে এ সকল ফরজ তরক করলে ওজু বাতিল বলে গণ্য হয়। এমনকি এ সকল ফরজ কার্যগুলিতে চুল পরিমাণ স্থানও যদি অধৌত থাকে তাহলেও ওজু বাতিল হয়ে যায়।

হাতের কনুইসহ ধৌত করা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা হয় আর দ্বিতীয় ভাগে কব্জি থেকে কনুইসহ ধৌত করা হয়। মুখমণ্ডল ধৌত করা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গড়গড়াসহ কুলি করা, দ্বিতীয় ভাগে চোখসহ সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। মুখমণ্ডল বলতে থুতনীর নিচ থেকে কানের পার্শ্ব হয়ে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত ধৌত করা বুঝায়। যে সকল

মেয়ে মানুষের নাক-কান ছিদ্র করা আছে, তাদের এসকল ছিদ্রসমূহের ভেতরেও পানি পৌছাতে হয়।

মাথার এক চতুর্থাংশ মছেহ করার বৈজ্ঞানিক কারণ, মুসলমান পুরুষরা টুপি আর মেয়েরা শাড়ি বা ওড়না পরে থাকেন– যা চুলের প্রায় গোড়া পর্যন্ত ঢেকে রাখে। মাথা মছেহর সময় ঢাকাহীন স্থানসমূহ ধৌত হয়ে যায়। মাথা মছেহর সময় হাত পানিতে ভিজিয়ে কানের ছিদ্রের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করানো এবং কানের পেছনদিক মুছে নেয়াও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দুই পা ধৌত করার সময় পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে হাতের আঙ্গুল চালনা করে পানি পৌছাতে হয়। মুসলমান পুরুষদের পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় পরা হারাম বা নিষিদ্ধ বিধায় গোড়ালী পর্যন্তই ধুলো-বালি-ময়লা লাগা স্বাভাবিক আর ওজুতে প্রত্যহই তা অন্তত পাঁচ বার ধৌত হয়ে যায়। নিয়মমাফিক প্রতিটি অঙ্গ তিন বার ধৌত করা হয় বিধায় সে সকল অঙ্গে ধুলো-বালি-ময়লা কোনমতেই অবস্থান করতে পারে না। শরীরের যে সকল অঙ্গে ধুলো-বালি-ময়লা বা অপবিত্র পদার্থ (নাজাছাত) সহজে স্থান করে নেয় সে সকল অঙ্গ ওজুর সময় আবশ্যিকভাবে ধৌত হয়ে যায়। ওজু অনাবৃত অঙ্গ ধৌত করার বিধান শুধু পবিত্রতাই যে আনয়ন করে তাই নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ইহা প্রতিটি মুসলমানের স্বাস্থ্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

'ভাইরাস' জীবাণু বা বীজাণু মানব দেহের বহু রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। একটি বিন্দুতে কয়েক শত থেকে কয়েক লক্ষ জীবাণু অবস্থান করতে পারে। এরা এত ক্ষুদ্র বিধায় ধুলো-বালি ময়লা-আবর্জনার সাথে অসংখ্য পরিমাণে মিশে থাকে। মানুষের পক্ষে কাঁচের বাক্সবন্দী হয়ে কখনও চলা সম্ভব নয়, আর সম্ভব নয় বায়ুহীনভাবে বেঁচে থাকাও। আর তাই ধুলো-বালি-ময়লা ও বাতাসের সাথে মিশে থাকা ঐ চোখে না দেখা জীবাণুগুলো তার শরীরে লাগবেই। গায়ের কাপড় জামাতেও এসকল জীবাণু লেগে থাকে। তবে মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে হলে তাকে মানব শরীরের ভিতরে ঢুকতে হয় আর তার জন্য প্রয়োজন মানবশরীরের সংস্পর্শে যাওয়া। শরীরের যে সকল স্থান অঢাকা অবস্থায় থাকে, মানুষের চলাফেরার সময় সে সকল অঙ্গে বা স্থানে সহজেই জীবাণুগুলো লেগে যায়। দৈনিক পাঁচবার ওজু করলে এসকল জীবাণু ধুয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। এতে সহজেই মুসলমানগণ ভাইরাসগঠিত অনেক রোগ, যেমন কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইম্পায়েমিয়া, পেরিকার্ডাইটিস, এণ্ডোকার্ডাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, ভেজিনাইটিস,

প্রস্টেটাইটিস, ইপিডিডামাইটিস, সালপিঞ্জাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, আথ্রাইটিস, যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস, পাইলাইটিস, ফোঁড়া, উদরাময়, আমাশয়, চক্ষুরোগ, ব্যাক্টেরেমিয়া, সেপ্টিসেমিয়া প্রভৃতির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

ওজুর ধারাটি পর্যালোচনা করলে এটা যে কত বিজ্ঞানভিত্তিক সহজেই অনুমান করা যায়। ভাইরাস ধুয়ে ফেলার জন্য 'ওজুর ধারা' যে বৈজ্ঞানিকভাবে কত গুরুত্বপূর্ণ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

মুসলমানদের মধ্যে ওজুর যে ধারাটি প্রচলিত হয়ে আসছে তা হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ১.কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা। ২. গড়গড়াসহ কুলি করা। ৩. নাকে পানি দেয়া। ৪.সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। ৫. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা। ৬. কানসহ মাথা মছেহ করা। ৭. গোড়ালী পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা।

খাঁটি বা পবিত্র পানির সাহায্যে যেহেতু ওজু সম্পন্ন করতে হয় সেহেতু আমরা দেখতে পাই, ওজুতে হাত ধোয়ার পর্বটি এসেছে আগে বা সর্বপ্রথমে। ওজুর অন্যান্য পর্ব সারতে হাত ব্যবহার করতে হয়। তাই ওজুতে প্রথমেই হাত ধুয়ে পরিস্কার করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া পানি পরীক্ষার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। পানিতে ময়লা-আবর্জনা থাকলে হাতে পানি নিলে প্রথমেই তা অনুভূত হবে। হাতে পানি নিলে সহজেই তা চোখের দৃষ্টিতে আসে এবং তাতে পানির মধ্যে দূষিত কিছু থাকলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। পানির রংটা কি তাও দেখা যাবে। খাঁটি পানির কোন রং থাকে না। অন্যদিকে প্রথমে হাত ধোয়া হয় বিধায় সর্বাগ্রে হাতে লাগা জীবাণুগুলো ধুয়ে যায়। পরে অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করার জন্য হাত ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা থাকে না।

পানির খাঁটিত্ব পরীক্ষার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে তার স্বাদ। খাঁটি পানির কোন স্বাদ নেই। ওজুর দ্বিতীয় পর্বে মুখে পানি নিলে স্বাদ পরীক্ষার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। গড়গড়াসহ কুলি করার দরুণ মুখের ভেতরে প্রবিষ্ট সকল জীবাণুই কুলির পানির সাথে বেরিয়ে আসে।

খাঁটি পানির কোন গন্ধ নেই। ওজুর তৃতীয় পর্বে নাকে পানি নিলে তারও পরীক্ষা হয়ে যায়। আর এতে নাকের ভেতরকার জীবাণুগুলোও বেরিয়ে আসে। প্রথম তিনটি পর্বে খাঁটি পানির গুণগুলো পরীক্ষা হয়ে গেলে চতুর্থ পর্বে চোখে পানি দেয়াসহ সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা হয়। চোখ শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। ইহার পেশীসমূহ পূর্বে যে সকল অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়েছে তাদের সবার চাইতে নরম ও মোলায়েম। পানিতে ময়লা আবর্জনা না

থাকলে এবং খাঁটি প্রমাণিত হলে পরেই তা চোখে আসে, ফলে চোখ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকেনা।

জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করার প্রধান পথ হচ্ছে মুখ ও নাক, আর হাত যেহেতু এগুলো প্রধান সাহায্যকারী, তাই হাত, মুখ ও নাক ওজুতে প্রথমেই ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। এটা কতই না বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! তারপর আসছে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা, দুই কানসহ মাথা মছেহ করা ও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করা। এদের মধ্যে জীবাণু লেগে থাকলেও অন্যান্যের তুলনায় এগুলোর গুরুত্ব কম আর ওজুতে তাই এগুলো পরে ধৌত হয়ে জীবাণুমুক্ত হচ্ছে। ওজুর ফরজ কার্যসমূহে চুল পরিমাণ স্থান অধৌত থাকলে ওজু বাতিল হওয়ার বিধান থেকে আমরা বুঝতে পারি, চুল পরিমাণ স্থানেও যে অসংখ্য জীবাণু লেগে থাকে ওজু তাও লেগে থাকতে দিচ্ছে না। আমরা এগুলো থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ওজুর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম।

জনৈক চিকিৎসক কোন এক সর্দি-জ্বরের রোগীকে ঔষধের সাথে এক গাড়ি খড়ের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছিলেন; কারণ রোগীর ঘরের চালের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ত। তার ঘরের ভেতর পানি পড়া দূর না হওয়া পর্যন্ত সর্দি-জ্বর স্থায়ীভাবে দূর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তেমনি ভাইরাসগঠিত রোগসমূহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চিকিৎসকগণ জনগণকে ওজুর বিধান পালন করতে দিয়ে অনেক ভাইরাসগঠিত রোগকে সহজেই প্রতিরোধ করায় সাহায্য করতে পারেন।

- মাসিক মদীনা ঃ আগস্ট '৮০
- মাসিক স্বাস্থ্য সাময়িকী ঃ জুলাই '৮০
- মাসিক আত-তাওহীদ ঃ জুন-জুলাই '৯৬
- বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ২৯.৮.৯৭
- মাসিক আবাবীল ঃ সূচনা সংখ্যা

রসূলে করীমের (সাঃ) ব্যক্তিজীবনের আলোকে গ্যাস্ট্রিক আলসারের স্বরূপ সন্ধান

গ্যাস্ট্রিক আলসার পাকস্থলীর একটি রোগ। পাকস্থলীতে ঘা হয়ে ব্যথা হওয়া এর প্রধান লক্ষণ। যে সব কারণে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে বিবেচনা করা হয় 'সময়মত না খাওয়া ও উপবাস থাকা'কে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাদের জীবনে এ দুটো ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। তা ছাড়া মুসলমান নারী-পুরুষ (বিশেষ কারণে ছাড় পাওয়া লোকজন ছাড়া) রোযায় উপবাস থাকে। সময়মত না খাওয়া ও উপবাস থাকাই যদি গ্যাস্ট্রিক আলসারের প্রধান কারণ হত তাহলে অভাবে সময়মত খেতে না পাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিটি লোক এবং রোযার উপবাস থাকার কারণে প্রতিটি মুসলমান গ্যাস্ট্রিক আলসারের কবলে পড়ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। আমাদের প্রিয় নবী সর্দারে কায়েনাত হযরত রসূলে মাকবুলের (সাঃ) জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি জীবদ্দশায় যত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে পেটের গোলমাল, পেটব্যথা বা গ্যাস্ট্রিক আলসারের উপস্থিতিজ্ঞাপক কোন ব্যথায় কখনো কষ্ট পাননি। রসূল (সাঃ) কিভাবে না খেয়ে থেকেছেন এবং উপবাসে কাটিয়েছেন নিচের হাদীসগুলো থেকে তার কিছুটা আঁচ করা যায় ঃ

১. আব্বাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে খেজুর আনা হলে তিনি তা খাচ্ছিলেন। তিনি তখন ক্ষুধার কারণে এতই কাতর ছিলেন যে নিজের শক্তিতে বসতে পারছিলেন না। তাই আমি দেখলাম যে তিনি কিছুতে ভর দিয়ে খাচ্ছিলেন।

২. হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন রসূলে করীম (সাঃ) এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন কখনও লাগাতার দুদিন যবের রুটি পেট ভরে আহার করেননি।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূল (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ কয়েক রাত উপর্যুপরি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। রাতের বেলায় খাবার কিছুই থাকত না। তাঁর অধিকতর খাদ্য হত যবের রুটি।

৪. মসরুক বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি **আমার জন্য খাবার** আনার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি কখনো পেট ভরে **আহার করি না। খেতে বসে আমার কেবল কাঁদতে মন চায়। তাই কাঁদতে থাকি। মসরুক জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদতে মন চায় কেন? তিনি বললেন, রসূলে করীমের (সাঃ)** সেই অবস্থা আমার স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে যায়, যে অবস্থায় তিনি **আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি কখনো দিনে দুবার গোশত অথবা রুটি দিয়ে পেটভরে আহার করার সুযোগ পাননি।**

৫. হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও **যবের রুটি দিয়েও উপর্যুপরি দুদিন পেট ভরেননি।**

অন্যান্য আরো কিছু হাদীস থেকে জানা যায়, হুজুর (সাঃ) যখন খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে খন্দকের মাটি কাটায় অংশ নিয়েছিলেন তখন তাঁর পেটে ক্ষুধার কারণে দুটি পাথর বাঁধা ছিল। তিনি মসজিদ থেকে গৃহে ফিরে এসে স্ত্রীদের কাছে সকালের খাবার আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন এবং ঘরে খাবার কিছু নেই জানতে পেলে রোযার নিয়ত করে ফেলতেন।

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে ফুটে উঠেছে নবী জীবনের উপবাস সংক্রান্ত ঘটনাগুলো। ফরজ রোযায় তো তিনি বছরে প্রতিদিন করে একমাস উপবাসে কাটিয়েছেনই (যা প্রতিটি বালেগ মুসলমানই করে) তা ছাড়াও জীবনে অনেক দিন বা দিনের পর দিনও উপবাসে কাটিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উপবাস থাকা বা সময়মত না খাওয়া যে গ্যাস্ট্রিক আলসার তৈরী করে না তাঁর জীবন থেকে এ কথার সত্যতা মিলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, "সময়মত না খেলে বা উপবাস থাকলে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্ম হয় বা গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যথা বৃদ্ধি পায়"। তাহলে তার ব্যাখ্যা কি হবে? এ প্রসঙ্গে গ্যাস্ট্রিক আলসার কি এবং সময়মত না খেলে বা উপবাস থাকলে কিভাবে জন্ম নেয় বা বাড়ে একবার দেখে নিই।

গ্যাস্ট্রিক আলসার কি ঃ আমরা যাকে পাকস্থলী বলি তাঁরই অন্য নাম স্টমাক (Stomach) বা Gastric (গ্যাস্ট্রিক)। যেহেতু গ্যাস্ট্রিক শব্দটিতে "গ্যাস' কথাটা রয়েছে তাই পেটে বায়ু জমলেই (Gas form করলে) কেউ কেউ বলে থাকেন, আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে। পেটে যে কোন ধরনের ব্যথা হলেই তাকে অনেকে গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যথা বলে ভুল করেন। পাকস্থলী বা গ্যাস্ট্রিকের অবস্থান বুকের খাঁচার ভিতরে। তাই কারো গ্যাস্ট্রিক আলসার হলে তার ব্যথাও বুকের খাঁচার ভিতরে হবে, পেটে নয়। গ্যাস্ট্রিক ছাড়াও পেটে বা

বুকে ব্যথা হলেই তা যে গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যথা- নির্ণয় না করে তা মনে করার কোন কারণ নেই।

আলসার (Ulcer) হচ্ছে ঘা। তাই গ্যাস্ট্রিক আলসার (Gastric Ulcer) হচ্ছে পাকস্থলীর ঘা। আমাদের খাবার গ্রহণের পর প্রথম যে থলিতে গিয়ে খাবারটা পড়ে তা-ই পাকস্থলী। এই পাকস্থলীতে কোন কারণে ঘা হলে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলা হয়।

গ্যাস্ট্রিক আলসার কেন হয়ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার বহুবিধ কারণ আছে। তাদের মাঝে নিয়মিত না খাওয়া ও উপবাস থাকাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার উৎপত্তির অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা হয়।

গ্যাস্ট্রিক আলসার কিভাবে হয় ঃ পাকস্থলীতে খাদ্য হযম করার জন্য অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থ এসে জমা হয়। এগুলো পাকস্থলীর আশেপাশে অবস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রে তৈরি হয়ে পাকস্থলীতে আসে। পাকস্থলীতে খাদ্যের উপস্থিতি ঘটলেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট যন্ত্রগুলো থেকে ঐ সব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে পাকস্থলীর খাদ্যের সাথে এসে মিলিত হয়। যে সকল রাসায়নিক পদার্থ আসে তার মাঝে অন্যতম প্রধান হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড কোন কাঠ বা চামড়ার উপর কিছুক্ষণ পড়ে থাকলে সে অংশটুকু পুড়ে গর্ত হয়ে যায়। কিন্তু পাকস্থলীতে এসে খাদ্যের সাথে মিলিত হলে তা খাদ্যকে পচিয়ে দিয়ে হযমে সাহায্য করে। পেটে যখনই বা যতবার খাদ্য পৌঁছে তখন বা ততবারই অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি হয়ে পাকস্থলীতে আসে। নিয়মিত খাদ্য খেলে নিয়মিত সময়ে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এসে উপস্থিত হয় এবং খাদ্যে মিশে তা খাদ্যের সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিয়মিত সময়ে খাদ্য না খেলে নিয়মাফিক অভ্যাসবশতঃ কারো কারো নির্দিষ্ট সময়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি হয়ে পাকস্থলীতে এসে উপস্থিত হয় এবং খাবার না পেয়ে পাকস্থলীর ভিতরের গায়ে অবস্থান করে। এটা যেহেতু পুড়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে তাই তা পাকস্থলীর গায়ে পুড়ে ফেলার মত জ্বালার সৃষ্টি করে। এ সময় কিছু খেলে খাদ্যের সাথে তা মিশে গিয়ে জ্বালা কমায়। কিছু খেতে না পারলে অন্ততঃ পানি খেলেও পানির সাথে মিশে এসিডটি তীব্রতা হারিয়ে পাতলা (Diluted Hcl) হয়ে পড়ে ও জ্বালা কমে। নিয়মিত না খেলে বা উপবাস থাকলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সময়মত পাকস্থলীতে বরাবরই আসে এবং পাকস্থলীর যে অংশে জমা থাকে সেখানে পুড়ে ঘা তৈরি করে ফেলে। এই ঘা-ই গ্যাস্ট্রিক আলসার বা

পাকস্থলীর ঘা। এই ঘা বেশিদিন স্থায়ী হলে এবং একইভাবে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের উপস্থিতি হতে থাকলে এক সময় এই ঘা পাকস্থলী ছিদ্র করে ফেলে এবং গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগীর জন্য এটি একটি জটিল অবস্থা। এ অবস্থায় দ্রুত অপারেশনের **(Surgery)** সাহায্য নিতে হয়।

পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছলেই প্রাকৃতিক নিয়মে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি হওয়া ও পাকস্থলীতে উপস্থিত হওয়া বিধি। কিন্তু তা না হয়ে নিয়মিত খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত এসিডটি তৈরি হওয়া ও পাকস্থলীতে পৌঁছা একটি ব্যতিক্রম বলা চলে। এতে পাকস্থলীতে খাদ্য আসুক বা না আসুক হাইড্রোক্লোরিক এসিড পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়।

আমরা অনুধাবন করতে পারি রসূলে মাকবুলের (সাঃ) পাকস্থলীতে এভাবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এসে পৌঁছাত না, তাহলে তিনি যেভাবে না খেয়ে থেকেছেন, উপোস কাটিয়েছেন এবং তার পরিমাণও যেখানে কম ছিল না– তাতে তাঁর গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়া অবধারিত ছিল। কিন্তু তাঁর কেন গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়নি?

পর্যালোচনা করলে একটি সত্য এভাবে বেরিয়ে আসে। তা হচ্ছে, হাইড্রোক্লোরিক এসিডের নিষ্ক্রমণ সুনিয়ন্ত্রিত এবং শুধু খাদ্য পাকস্থলীতে হাজির হলেই তার আগমন ঘটে থাকে। নবীজীবনে তা-ই ঘটেছিল। কেননা, খাদ্যের ব্যাপারে রসূল (সাঃ)-র মত জীবন যাপন করেছেন এমন অনেক সাহাবী, অলী, আউলিয়া এমনকি সাধারণ মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায় যারা উপোস কাটালেও গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভোগেননি বা ভোগেন না।

নবীজীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে সবর-এর অনুপম দৃষ্টান্ত। এই সবরই নবীদেহের হাইড্রোক্লোরিক এসিড নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সবরের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ধৈর্য। কিন্তু ধৈর্য ও সবর প্রকৃতপক্ষে সমার্থক নয়। 'খাবার পাক হচ্ছে, হলেই খেতে পাব' এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যে অপেক্ষা এটাই ধৈর্য। কিন্তু 'আল্লাহ আমার জন্য যে সময়ে খাবার নির্ধারিত করেছেন সে সময়েই খাবার পাব' এটার নাম সবর, এটা ধৈর্য নয়। ধৈর্য রসনাকে রান্না শেষ হওয়ার মত জাগতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, অন্যদিকে সবর দ্বারা ভোক্তা নিজের রসনাকে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যাতে রান্না হলেও খাবার না পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয় না। আর তাতে তার কোন ক্ষোভও প্রকাশ পায় না। নবীজীবনে এই সবরের ঘটনাই তাঁর রসনাকে জাগতিক চাহিদা থেকে

নিবৃত্ত করেছে এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করে গ্যাস্ট্রিক আলাসারের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করেছে।

এ ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণাটি হচ্ছে একধরনের কনডিশন্ড রিফ্লেক্স (Conditioned reflex)। প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ইভান পাবলভ কুকুর নিয়ে এ কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স ধরনের গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যে সকল কুকুর রাস্তায় চরে বেড়ায়, তাদের মুখটা সর্বদাই হা হয়ে থাকে, জিহ্বাটা বেরিয়ে থাকে এবং জিহ্বা থেকে অনগল লালা ঝরতে থাকে। কুকুরের ক্ষুধা পেলে জিহ্বা থেকে লালা ঝরে। এতে বুঝা যায়, রাস্তার কুকুরের সব সময়েই ক্ষুধা থাকে। ওদের খাবারের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। কেউ তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ায় না। তারা রাস্তায় চরে বেড়ায় এবং যখন যা পায়, তখনই তা খায়। ওদের খাবারের প্রয়োজন পেটের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না। যখন যা পায়, তখনই তা খাওয়ার কারণে তাদের ক্ষুধা সকল সময়েই বর্তমান থাকে। তাই যখন তখন পেলেও খায়, চুরি করেও খায়। পালিত কুকুরের বেলায় তা হয় না। পালিত কুকুরদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেয়া হয়। পেটের প্রয়োজন অনুপাতে দেয়ার কারণে তাদের ক্ষুধাবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়। খাবার সময়েই তার ক্ষুধা অনুভূত হয়। অন্য সময়ে তাই খাবার পেলেও তাতে মুখ লাগায় না, চুরি করারতো প্রশ্নই আসে না। আর এ কারণেই তাদের মুখ হা হয়ে থাকেনা বা অসময়ে জিব থেকে লালা ঝরে না।

উক্ত বিজ্ঞানী রাস্তার একদল কুকুর ধরে এনে ঘরে বেঁধে ফেললেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে একটা বেল বাজিয়ে শব্দ তৈরি করেন ও তার পরপরই কুকুরদের সামনে প্রয়োজনীয় ও পরিমাণমত খাবার পৌছে দেন। এভাবে কিছুদিন অনুশীলন করার পর কুকুর বুঝতে পারে, ঘন্টা বাজলেই খাবার আসে, অন্য সময় নয়। তাই কুকুরের রসনা ঘন্টার শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং ঘন্টা না বাজা পর্যন্ত তার মুখ থেকে লালা নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যায়, ঘন্টা বাজার সাথে সাথে ঐ সব কুকুরের জিব থেকে লালা ঝরতে থাকে।

বিজ্ঞানী পরবর্তীতে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঘন্টা বাজিয়ে খাবার না আনলেও মুখ থেকে লালা ঝরে এবং ঘন্টা না বাজিয়ে খাবার আনলেও লালা ঝরে না। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিয়ে ঘন্টার শব্দটি এলোমেলো সময়ে প্রয়োগ করে বা না বাজিয়ে কুকুরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা হয়। এতে ফল পাওয়া যায় যে, নির্দিষ্ট সময় এলেই কুকুরের লালা ঝরে। এর অর্থ হল, ক্ষুধা নির্দিষ্ট সময়ে হয়, অন্য সময়ে হয় না। এভাবে লক্ষ্য করা

যায় যে, এসব কুকুরেরও অসময়ের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং অসময়ে খাদ্য পেলেও এরা খায় না।

এর কারণ কি? এদেরকে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে কুকুরের রসনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানুষের বেলায়ও এটা হওয়া সম্ভব। সময়ে অসময়ে খাদ্য খেলে বা উপবাস থাকলে তা যদি রসনাকে প্রভাবিত না করে তাহলে পেটের ভিতর হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত থাকে। রসূলে মাকবুল (সাঃ) সবর-এর মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণ ধৈর্যের চাইতে সবর বা আল্লাহর নামে উৎসর্গীত ধৈর্য হাইড্রোক্লোরিক এসিডসহ সমুদয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

মুসলমানদের জন্য সবরের অনুশীলন এবাদত হিসেবে গণ্য। তাই খাদ্যের ব্যাপারে সবর অনুশীলনকারী কোন মুসলমানেরই গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রসূলই (সাঃ) এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ।

- ❑ মাসিক আত-তাওহীদ ঃ মার্চ '৯৫
- ❑ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ঃ ৯.৮.৯৫
- ❑ দৈনিক মিল্লাত ঃ
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ৩.৭.৯৮
- ❑ সীরাত পুরস্কারপ্রাপ্ত ঃ কিশোরগঞ্জ, সা. স. পরিষদ ১৪১৬ হিঃ

ইসলাম ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে স্বল্পাহার

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যগ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। খাদ্যগ্রহণ না করে মানুষ বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেনা। কিন্তু মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কতটুকু? আমাদের পিয়ারে নবী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্যগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে মানুষের জন্য একটি সীমারেখা পাওয়া যেতে পারে।

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পারিবারের সদস্যবর্গ কয়েকরাত উপর্যুপরি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। রাতের বেলায় খাবার কিছুই থাকত না। তাঁর অধিকতর খাদ্য হত যবের রুটি।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো যাবের রুটি দিয়েও উপর্যুপরি দু'দিন পেট ভরেননি।

৩। মসরুক বলেন, আমি হযরত আয়শা (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি কখনো পেট ভরে আহার করিনা। খেতে বসে আমার কেবল কাঁদতে মন চায়, তাই কাঁদতে থাকি। মসরুক জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদতে মন চায় কেন? তিনি বললেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অবস্থা আমার স্মৃতিতে জাগ্রহ হয়ে যায়, যে অবস্থায় তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি কখনো দিনে দু'বার গোশত অথবা রুটি দিয়ে পেটভরে আহার করার সুযোগ পাননি।

৪। হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন কখনও লাগাতার দু'দিন যবের রুটি আহার করেননি।

৫। আব্বাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খেজুর আনা হলে তিনি তা খাচ্ছিলেন। তিনি তখন ক্ষুধার কারণে এতই কাতর ছিলেন যে, নিজের শক্তিতে বসতে পারছিলেন না। তাই আমি দেখলাম যে, তিনি কিছুতে ভর দিয়ে খাচ্ছিলেন।

৬। একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সাহাবীরা সকলেই উপবাসী, ক্ষুধায় ক্লান্ত ও ক্ষীণ। যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে প্রায় সকলেই পেটে পাথর বেঁধে আছেন। কয়েকজন ক্ষুধাক্লিষ্ট সাহাবী একদিন দলবদ্ধভাবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ক্ষুধার অনুযোগ জানালেন এবং কাপড় তুলে

দেখালেন সকলের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা। কিছু না বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দেহ মুবারক থেকে কাপড় সরালেন। সকলে অবাক হয়ে দেখলেন সেখানে দু'টি পাথর বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের চেয়ে অধিকতর ক্ষুধার্ত।

৭। একবার হযরত তালহা (রাঃ) বাড়িতে ছুটে এসে তাঁর বিবিকে বললেন, খাবার কি আছে এখনি দাও। আমি (মসজিদে নববীতে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখে এলাম। (কতদিন তিনি অনাহারে আছেন জানিনা,) তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এসেছে।-বুখারী।

৮। আয়শা (রাঃ) বলেন, আমাদের পরিজনের দু'টা মাস অতিবাহিত হত কিন্তু তার মধ্যে আমরা উনুনে আগুন জ্বালাতাম না। শুধু খেজুর, পানি ও সামান্য শুকনো গোশ্‌ত ছাড়া আর কোন আহার্য থাকতনা।-শাইখাইন।

এসব হাদীস থেকে জানা যায় রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট সম্পূর্ণ পুরে আহার করেননি। পেটের তিনভাগের একভাগ খাদ্য, তিনভাগের একভাগ পানি ও বাকী তিনভাগের একভাগ খালি রেখে আহার সম্পন্ন করার ইসলামী নীতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আলোচনায় স্বল্পাহারকে খাদ্য গ্রহণের সীমারেখা বলে সাব্যস্ত করা চলে।

বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে দেখেছেন পরিমিত খাদ্যগ্রহণ সুস্থ থাকার পূর্বশর্ত। খাবারের পরিমাণ হবে যথার্থ, আনুপাতিক এবং অবশ্যই নিয়মমাফিক। প্রয়োজনীয় খাবারের ঘাটতি শরীরের কিছুটা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার থেকে জন্ম নেবে মেদ, স্থুলদেহ, এমনকি ক্যান্সারের মত মারাত্মক ব্যাধি। স্বল্প পরিশ্রম করলে এবং অতিভোজন করলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি পায়। মেদবৃদ্ধি শরীরে অনেক রোগ-ব্যাধি জন্মের জন্য দায়ী। শরীর প্রয়োজনীয় খাদ্যগ্রহণ করলে তা শরীরের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ শরীরের মাংসপেশীর স্তরে স্তরে চর্বি হয়ে জমে। এই চর্বিই হচ্ছে মেদ। শর্করা বা চিনি থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত শক্তিটুকুও মেদ হিসেবে শরীরে জমা হয়। চিনি বা শর্করা শরীরে শক্তির যোগান দেয়। অতিরিক্ত চিনি থেকে প্রাপ্ত শক্তি শরীর চালান করে দেয় শরীরের চর্বিকোষে। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শরীরের চর্বিকোষ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তারপর আর বাড়েনা। কোষের পরিমাণ না বেড়ে চর্বিকোষ বাড়ে আকারে। ফলে শরীর মোটা হয়। মেদ বৃদ্ধি পায়। শর্করা ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত হয়ে শক্তি তৈরী করার কাজ সম্পন্ন করার পর অতিরিক্তটুকু চর্বি হিসেবে শরীরে স্তুপীকৃত হয়। প্রোটিন গঠন করে মাংসপেশী, অস্থি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক উপাদান। তাই অতিরিক্ত প্রোটিন খেলে

পেশী হবে সতেজ, সবল। মাত্রাতিরিক্ত প্রোটিন শরীরের বহুল বৃদ্ধি ঘটিয়ে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতিভোজন মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয় বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। বৃদ্ধ বয়সে যত রোগ-শোক আক্রমণ করে তার জন্য দায়ী অতিভোজন। অতিভোজন যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। গুরুপাক খাদ্যও স্বাস্থ্যের জন্য তেমনি অকল্যাণকর। গুরুপাক দ্রব্য থেকে ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বলে বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত ভোজনের কারণে শরীরে চর্বি বা মেদ বেড়ে গেলে স্বল্প গরমেও মানুষ অতিরিক্ত গরম অনুভব করে। তাতে মানুষের হাইফাই অবস্থা, অস্বস্থি সৃষ্টি হয়। মেদ বা চর্বি বেড়ে যাওয়ার দরুণ চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। মেদ যদি লিভারে জমে তবে লিভার যন্ত্রের অসুস্থতা দেখা দেয়। শরীরের কোন অঙ্গ অতিরিক্ত খাদ্যের প্রভাবে পড়ে যদি মোটা হয়ে যায় তবে তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফুসফুসে অতিরিক্ত মেদ বা মেদবহুল অঙ্গের চাপ পড়লে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। কিডনী বা মূত্রাশয়ে মেদবহুল অঙ্গের চাপ পড়লে কিডনী ঠিকমত কাজ করতে পারেনা বা মূত্রাশয়ে প্রয়োজনীয় মূত্র জমার স্থান কমে যায়। ফলে ঘন ঘন প্রশ্রাবের বেগ হয় ও ঘন ঘন প্রশ্রাব হয়। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি বা মেদ জমলে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় বর্জ পদার্থ বের হতেও বাধার সৃষ্টি করে। এতে পায়খানা কশা হয়ে যেতে পারে।

শরীর বেশি মোটা হয়ে গেলে অনেক কাজ-কর্ম করতেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেলে ডায়েটিং করার জন্য চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ডায়েটিং হল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি, মেদ বা মোটাত্ব কমিয়ে ফেলা যায়। ডায়েটিং করলে শরীরের বিপাকীয় হার কমে যায়, এতে দেহের ক্যালরি কম পোড়ে। ডায়েটিং-এর সাথে ব্যায়াম চর্চা করলে শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক সত্যটি এই যে, একবার শরীরের চর্বিকোষগুলো বেড়ে গেলে সেগুলো কখনোই কমেনা। এজন্য বিড়ম্বনাই বাড়ে। তাই এমন ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ যেন চর্বিকোষ বাড়ার সুযোগ না পায়। এর একমাত্র উপায়ই হল স্বল্পাহার। জীবনের শুরু থেকে স্বল্পাহারে অভ্যস্থ হয়ে উঠলে শরীর সব সময়ই থাকবে সুন্দর, সুঠাম, স্বাস্থ্যবান। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে এব্যাপারে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ মে '৯৭

ইসলামের পানাহার ঃ বিজ্ঞানের আলোকে

মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে, না বাঁচার জন্য খায় এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মানব জীবনে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে ব্যক্তি ইলম ও আমলের সাহায্যকল্পে বা আল্লাহর ভয়ের শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত খাদ্য গ্রহণ করে তার পানাহার ইবাদত বলে গণ্য হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎ কাজ করুন। আপনারা যে কাজ করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।" (সূরা আল-মুমিনুন ঃ ৫১ আয়াত।) রসূলে করীম (সাঃ) বলেন,"বান্দা নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজে পুণ্য লাভ করতে পারে, এমনকি ঐ লোকমার জন্যও তার পুণ্যলাভ হয় যা সে নিজ মুখে তুলে নেয় এবং যা সে তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়।" ধর্মের সাহায্যকল্পে পানাহারের সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করে খাদ্য গ্রহণ করলে এ পুণ্যলাভের সুযোগ ঘটে।

পানাহার মানবের জন্য একটি আবশ্যক কর্ম। ইসলাম মুসলমানের জন্য কিছু বিধি-বিধান সাব্যস্ত করেছে। এ বিধি-বিধান মেনে চলে পানাহার সম্পন্ন করলে ক্ষুন্নিবৃত্তির সাথে সাথে পুণ্য অর্জনেরও পথ উন্মুক্ত হয়। ইসলামের এ পানাহার পদ্ধতি বিজ্ঞানের আলোকেও মর্যাদাসম্পন্ন।

ইসলামের মতে খাদ্য হালাল হতে হবে। হালাল খাদ্য শরীরের জন্য যেমন উত্তম তেমনি মনের জন্যও সুফলদায়ক। হালাল খাদ্য গ্রহণ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। ফলে মুসলমান কখনো হারাম খাদ্য গ্রহণ করার চিন্তা করতে পারেনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত হালাল খাদ্য তৈরী করেছেন সবগুলোতেই রয়েছে উপকার এবং হারাম খাদ্যে রয়েছে অমঙ্গল। চাল, ডাল, মাছ, গোশত, ডিম, দুধ, কলা, পানি প্রভৃতি হালাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর পুষ্টি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। শূকরের মাংস, মদ প্রভৃতি হারাম খাদ্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর। যে সকল খাদ্য হালাল পথে উপার্জিত নয় সেগুলো খাওয়াও বৈধ নয়। সেগুলো মনকে করে কলুষিত, আত্মাকে করে মৃতপ্রায়। হালাল খাদ্য মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে, তৃপ্তি প্রদান করে। শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। হারাম খাদ্য অতৃপ্তির বাহন। শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পাদন ও অসম পুষ্টির

কারণ হওয়ায় রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটায় এবং শারিরীক ও মানসিক অশান্তির নিয়ামক হয়ে থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ,

মোমেনগণ, পরস্পর পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা।" (আল কোরআন)।

খাদ্য গ্রহণের আগে হাত ধোয়া ইসলামের রীতি। রসূল (সাঃ) বলেন, "আহারের পূর্বে ওজু দরিদ্রতা এবং আহারের পরে ওজু বাজে চিন্তা নিবারণ করে।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আহারের পূর্বে ও পরে ওজু দরিদ্রতা নিবারণ করে।' আমরা সারাদিনে সাধারণতঃ তিনবার প্রধান আহার সম্পন্ন করি। এছাড়াও একাধিকবার হালকা আহার গ্রহণ কারো কারো অভ্যাস। খাদ্য গ্রহণের এই সময়গুলোর মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকে। এ সময়ে আমরা অন্য কাজ করে থাকি। কাজ করার দরুন অথবা কাজ না করলেও ময়লা ধুলোবালি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এসে আশ্রয় নেয়। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত ধুলে এসব ময়লা, ধুলোবালি পরিস্কার হয়ে যায়। তা ছাড়া অহরহ আমাদের শরীরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে অনেক রোগের জীবাণু। এগুলো কোনো রকমে শরীরের ভিতর প্রবেশ করলে রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হয়। খাওয়ার আগে হাত ধুলে এসব জীবাণু ধুয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে রোগ সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়। রোগ জীবাণুগুলো যে শুধু হাতেই লেগে থাকে এমন নয়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তারা বাসা বাঁধে। খাওয়ার আগে ওজু করলে সেগুলোও ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যায়। শরীরের ভিতরে জীবাণু প্রবেশের যতগুলো পথ রয়েছে ওজু করলে তার সবগুলোই ধুয়ে ফেলা সম্ভব হয়। অন্যদিকে ধর্মকর্মের সাহায্যকল্পে খাদ্য গ্রহণ ইবাদতরূপে গণ্য। সুতরাং খাদ্য গ্রহণরূপ ইবাদত ওজুর মাধ্যমে সম্পাদন করাই সমীচীন।

ইসলাম মেঝের উপর দস্তরখান রেখে তার উপর আহার্যদ্রব্য রেখে আহার করার উপদেশ দেয়। রসূলে করীম (সাঃ) খাদ্যদ্রব্য দস্তরখানের ওপর রেখে আহার করতেন। কেননা, তা বিনয় ও নম্রতার লক্ষণ।

খাদ্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। খাদ্য ব্যতিরেকে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারেনা। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক উত্তম পন্থা হল তাঁর প্রতি নম্র হওয়া। খাদ্য মেঝের ওপর রেখে গ্রহণ করায় সে নম্রতা প্রকাশ পায়। এতে আল্লাহর প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। খাদ্য নিচে রাখলে খাদ্য ও মুখের মাঝে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর কারণে মুখের ভিতরকার লালাগ্রন্থি থেকে খাদ্য মুখে আসা পর্যন্ত অধিক্ষণ রসক্ষরণ-এর সুযোগ ঘটে। লালাগ্রন্থির ক্ষরিত রস খাদ্যকে

সহজগ্রাহ্য করতে ও হজম উপযোগী করতে সাহায্য করে। খাদ্য হাত দিয়ে খাওয়াও ইসলামের রীতি। ফলে নিচ থেকে মুখ পর্যন্ত দূরত্বে খাবার পৌঁছাতে হাতের যে ব্যায়াম সাধিত হয়, টেবিলে রেখে খেলে তা হয়না। এ ব্যায়ামের কারণে হাতের পেশীগুলো সতেজ ও সবল থাকতে সহায়ক হয়।

খাদ্য সহজগ্রাহ্য হলে তৃপ্তি অনুভূত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত লালা বেরুনোর সুযোগ পেলে খাদ্য সহজগ্রাহ্য হয়, ফলে এ খাদ্যে তৃপ্তি অনুভূত হয়। তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ কামশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরের সকল গ্রন্থিকে সচল করে তুলে।

নমনীয়ভাবে বসে খাদ্য গ্রহণ ইসলামের আরেক বিধান। রসূল (সাঃ) কখনও তাঁর দুই হাঁটুর ওপর বসতেন, কখনো পায়ের পিঠের ওপর বসতেন, কখনো বা ডান পা বাম পায়ের ওপর রেখে বসতেন।

খাদ্যের জন্য অঙ্গের মাঝে বেশি অংশগ্রহণ করে মুখ, বুক ও পেট। পায়ের ওপর বসলে মুখ, বুক ও পেটের অংশগুলো সহজতর আরামদায়ক (Relaxation) পদ্ধতিতে অবস্থান করে। খাদ্য চর্বন, পাকস্থলীতে প্রেরণ এবং পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অংশ ডিউডেনামে স্থানান্তর এতে সহজতর হয়। এতে হযম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যের বর্জ্য পদার্থ সহজে নির্গমণ হতে পারে। পায়ের ওপর বসার দরুণ সমুদয় হাত পা স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে যা খাদ্য দ্রব্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। সহজ পদ্ধতিতে বসার কারণে খাদ্যনালীর প্যারাসটলসিস প্রক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। ফলে খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সময়মত সারা শরীরে পৌঁছা যেমন সহজ হয়, তেমনি অহেতুক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও দূরীভূত হয়।

হুযুরে আকরাম (সাঃ) বলেন, "আমি হেলান দিয়ে আহার করিনা। কেননা আমি একজন বান্দা বা দাস মাত্র। যেরূপ একজন গোলাম বা দাস বসে, তদ্রূপ আমি বসি।"

চেয়ারে বসে আহার করলে পিছনে হেলান দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। যারা রসূলে করীমের (সাঃ) আদর্শকে সম্মান করেন বা মান্য করেন তাদের পক্ষে এমন করা সমীচীন নয়। হেলান দিয়ে বসলে শরীরের নমনীয়তা (Relaxation) নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা উপকারী নয়।

খাদ্যের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি রক্ষা করা ইসলামের বিধি। খাদ্য আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে যখন যে খাদ্য প্রদান করেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থই হল আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি রাজি থাকা। একজন বান্দা যদি মনিবের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তবে মনিব তাকে ভাল না বেসে কি পারেন?

❑ মাসিক আত তাওহীদ ঃ এপ্রিল-মে '৯৭

মধু ঃ কুরআন ও বিজ্ঞানে

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

'আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন ঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু ডালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে'। – সূরা নাহ্‌ল ঃ ৬৮, ৬৯ আয়াত

মধু কিভাবে তৈরি হয় ঃ ফুলের পুষ্পমঞ্জরী থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে। মাত্র ১০০ গ্রাম মধু আহরণ করতে মৌমাছিকে প্রায় দশ লক্ষ ফুলে ভ্রমণ করতে হয়। ফুল থেকেই ফলের জন্ম হয়। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়নে সহায়তা করে ফুলে ভ্রমণ করলেও পক্ষান্তরে ফলেই ভ্রমণ করে থাকে। একটি পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছি তার দেহের ওজনের পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ থেকে দুই-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পুষ্পরস সংগ্রহ করে পাকস্থলীতে বয়ে নিয়ে গৃহস্থ মৌমাছিদের কাছে জমা দেয়। গৃহস্থ মৌমাছি পুষ্পরসকে পাকস্থলীতে ধারণ করে এবং তাকে ১২০ থেকে ১৪০ বার উদগীরণ ও গলাধঃকরণ করে। ফলে পাকস্থলীতে জটিল প্রক্রিয়ায় মধু তৈরি হয়। অতঃপর তা মৌচাকের কুঠরীতে জমা করে মোম দিয়ে ঢেকে দেয়। আল্লাহর আদেশে মৌমাছি পর্বতগাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু ডালে যে গৃহ তৈরি করে তাই মৌচাক নামে পরিচিত। এই মৌচাকেই সঞ্চিত হয় মধু।

মধুতে কি থাকেঃ আল্লাহ বলেন, 'তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের পানীয় নির্গত হয়।' বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষা করে দেখেছেন মধুর রং ও উপাদানে পার্থক্য থাকে। স্বাদ, সৌরভ ও ঘ্রাণও হয় ভিন্ন। মধুর রং পানির মত বা সোনালী ঘন লাল। কোন কোন ক্ষেত্রে মধুর রং হয় হালকা রকমের। মধুর মূল উপাদানগুলো

হচ্ছে পানি, শর্করা বা চিনি, এসিড, খনিজ, আমিষ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন। শর্করাগুলোর মধ্যে থাকে লেভোলোজ, ডেকট্রোজ,মালটোজ, ডাইম্যাকারাইড এবং কিছু উচ্চমানের চিনি। মধুতে যে সব এসিড পাওয়া যায় সেগুলোর নাম সাইট্রিক, ম্যালিক, বুটানিক, গ্লুটামিক, স্যাক্সিনিক, ফরমিক, এসেটিক, পাইরোগ্লুটামিক এবং এমাইনো এসিড।

মধুতে মিশ্রিত খনিজ দ্রব্যগুলো হচ্ছে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কপার, লৌহ, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি। থায়ামিন, রিভোফ্লোবিন, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড নামক ভিটামিন মধুতে বিদ্যমান থাকে। এগুলো মিলে মধু তরল আকার ধারণ করে। তাই আল্লাহ্ বলেন,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

'তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের পানীয় নির্গত হয়'।

মধুর ঔষধি গুণ ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

'এতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সাহাবী তার ভাইয়ের অসুখের কথা বললে তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন অসুখ পূর্ববৎ রয়েছে। তিনি আবারও মধু খেতে পরামর্শ দেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে অসুখের কোন পরিবর্তন হয়নি তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী।' এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হলে সুস্থ হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন মধুর রয়েছে এক শক্তিশালী জীবাণুনাশক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার নাম 'ইনহিবিন'। মধুর সাথে কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হলে তা তরলীভূত হয়ে পড়ে। গ্লুকোজ অক্সিডেজ নামক বিজারকের সাথে মধুর বিক্রিয়া ঘটলে গ্লুকোনা ল্যাকটোন হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মধুতে দিলে মারা পড়ে।

মধু ইস্টের (Yeast) বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দেয়না। এ কারণে খাঁটি মধু বোতলজাত করে অনেক দিন রাখা যায়। মধু একটি উৎকৃষ্ট প্রিজার্ভেটিভ। চিকিৎসা শাস্ত্রের এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিতে ঔষধি গুণ বেশি দিন ধরে রাখার জন্য ঔষধের সাথে এলকোহল বা রেকটিফাইড স্পিরিট মিশানো হয়। ইউনানীতে তৎপরিবর্তে মিশানো হয় মধু। বার্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ শব দাহ করার পূর্বে মধুতে ডুবিয়ে রেখে সংরক্ষণ করতেন। মিশরে গিজেহ্ পিরামিডের গহ্বর মধু দ্বারা পূর্ণ করা ছিল। সারা পৃথিবীতে কাশির ঔষধ ও অন্যান্য মিষ্টিদ্রব্য তৈরীতে প্রতিবছর কমপক্ষে ২০০ টন মধু ব্যবহৃত হয়। খুশখুসে কাশিতে মধুর সাথে লেবুর রস উপশমদায়ক। মাতাল রোগীদেরকে স্থিরাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে মধু কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

গ্লুকোজের ঘাটটিতে হৃদপেশীর শক্তি কমে যায়। মধুর ব্যবহার এ ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। ধমনী সম্প্রসারণ ও করোনারী শিরার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত মধু পান করলে রক্ত কণিকার সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মধু উত্তম পানীয়। হাঁপানী রোগে মধুর স্থান সবার উপরে। প্যারিসের ইনস্টিটিউট অব বী কালচার-এর পরিচালক রিমে কুভিন বলেন, রক্তক্ষরণ, রিকেট, ক্যান্সার এবং শারীরিক দুর্বলতায় মধুর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। চিনির বদলে শিশুদেরকে মধু খেতে দেয়া হয়। চিনি দন্ত ক্ষয় ঘটায় কিন্তু মধু তা করেনা। মধু ব্যবহারে নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়ে ওঠে।

এক চামচ বাদাম তেলের সাথে দু চামচ মধু মিশিয়ে কাটা বা পোড়ার ক্ষতে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ইনফেকশন, সাধারণ ঘা, ত্বকের আলসার, পচা-গলা ঘা মধু ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য হয়। নারীদের গোপনাঙ্গের অসহনীয় চুলকানীতে মধুর ব্যবহার অতীব কার্যকরী।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে"। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মধু খাদ্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। দুধের পরেই আদর্শ খাদ্য হিসেবে মধুর স্থান। মধু সহজেই পরিপাক হয়। শর্করা থাকায় তা সহজেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মধুর ক্যালরি উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। প্রতি কেজি মধুতে ৩১৫৪ থেকে ৩৩৫০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তি থাকে। এ্যাথলেট, ফুটবলার, ক্রিকেটার, সাঁতারু,

সাইক্লিষ্ট, পর্বতারোহী, ভ্রমণকারী, অফিস-আদালতে মানসিক ও শারীরিক শ্রম প্রদানকারী, কৃষক, শ্রমিক সবার জন্যই মধু এক উৎকৃষ্ট পানীয়।

মধু শক্তি যোগানোর পাশাপাশি ভিটামিন, খনিজ ও এনজাইম সরবরাহ করে। মধু থেকে প্রসাধনীও তৈরি হয়। ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায় মধুর ভূমিকা খাট করে দেখার অবকাশ নেই। পোড়া ক্ষতে মধু ব্যবহার করলে প্রদাহ হয়না এবং পরবর্তীকালে পোড়ার দাগ তেমন থাকেনা।

মৌমাছি একটি বিষক্ত প্রাণী। তার হুলে থাকে বিষ। মৌমাছির হুলের বিষ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় হোমিওপ্যাথিতে Apis Melifica ঔষধটি তৈরি করা হয়েছে। শরীরে মৌমাছির হুল ফোটানোর মত জ্বালা, হুল ফোটানোর পর যেভাবে ফুলে যায় শরীরে এমন এলার্জি দেখা দিলে এবং শোথ রোগে 'এপিস মেল' দারুণ কার্যকরী ঔষধ। প্রশ্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, এমনকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে হুল ফোটানোর মত জ্বালা থাকলে এপিস মেল অব্যর্থ।

মধু নিঃসন্দেহে উত্তম ও উপকারী পানীয়। মধু ও মধুমক্ষিকা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহর আদেশে বিশেষ কৌশলে মধু উৎপাদনকারী মৌমাছিও তাই আল্লাহর এক প্রিয় সৃষ্টি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

❑ মাসিক মুইনুল ইসলাম ঃ জানুয়ারী '৯৬
❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ২৮.১১.৯৭
❑ মাসিক অগ্রপথিক জুন '৯৭
❑ দৈনিক আল মুজাদ্দেদ ঃ ২৭.২.৯৬

দুধ ঃ কোরআনে ও বিজ্ঞানে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ

فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত দুগ্ধ–যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। – সূরা নাহ্‌ল ঃ ৬৬ আয়াত

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রথম এবং প্রধান খাদ্যই হচ্ছে দুধ। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। শিশুরা মায়ের দুধ পান করে অনেকদিন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষও শুধু দুধ পান করে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ লৌহ উপাদান না থাকায় বাইরে থেকে লৌহ সরবরাহ করলে দুধ খেয়ে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব।

আল্লাহ বলেন,

اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً

তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।' আমরা যাদের কাছ থেকে আমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ দুধ পাই তারা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত–সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। জ্ঞানে-গুণে বুদ্ধিতে, শিক্ষায়–মননে মানুষের সমতুল্য কোন জাতি আল্লাহ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেননি। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের খাদ্য তিনি তৈরী করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর স্তনে। যে স্তন থেকে চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে, সে স্তন থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্য দুধ আহরিত হয়। মানুষকে মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে ইহকালের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে, এ জবাবদিহির উপর নির্ভর করে তাদেরকে বেহেশত বা দোযখের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে, চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায় তা হবে না। ওখানে তাদেরকে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবেনা, দুনিয়ার জীবনই তাদের শেষ জীবন। কিন্তু দুনিয়াতে জীবন ধারণের বেলায় মানুষের জীবন ও পশুর জীবনকে দুধের উপর

নির্ভরশীল করে পশুকে আল্লাহর সৃষ্টির অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে। মানুষ যেমন আল্লাহর এক সৃষ্টি, পশুও তেমনি তাঁরই সৃষ্টি। মর্যাদা হিসেবে মানুষ ও পশুর মাঝে বিরাট ব্যবধান থাকলেও সৃষ্টি হিসেবে মানুষ ও জন্তু আল্লাহর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। জন্তুর দুধ মানুষের খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত করার মাঝে রয়েছে এক অলৌকিক দর্শন। এক সৃষ্টির প্রতি আরেক সৃষ্টির মুহাব্বত তৈরি করার এ যে এক অভূতপূর্ব কৌশল। এখানে নিহিত রয়েছে হক্কুল ইবাদ-এর গুঢ় রহস্য। চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে চিন্তা করার যে অবকাশ রয়েছে বলে আল্লাহ্ বর্ণনা করেন এটি তার একটি।

চতুষ্পদ জন্তুদের স্তন থেকে দুধ আহরিত হয়। এখানে মানুষের চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুরা ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ঘাস, লতা-পাতাকে বেটে রস বের করলে তা থেকে এক ফোঁটা দুধ বের করা যাবে না। যেটুকু খাদ্য খেয়ে চতুষ্পদ জন্তু যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সে বস্তু থেকে তার এক দশমাংশ দুধ কোন মতেই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। শুধু খাদ্য খেলেই দুধ তৈরী হয়না। খাদ্য না খেলেও চতুষ্পদ জন্তুর স্তন থেকে দুধ পাওয়া যায়। খাদ্যের সাথে দুধের পরিমাণের সামান্য হের ফের হয় মাত্র। এ যে আল্লাহর আরেক অপূর্ব লীলা কৌশল! মানুষের চিন্তার অতীত এ প্রক্রিয়া। পশুর স্তন ও দেহ যেন এক স্বয়ংক্রিয় দুগ্ধ উৎপাদন কারখানা। এ কারখানার সাথে মানুষের তৈরি কোন কারখানারই তুলনা হতে পারেনা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِى بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا

'আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়। রক্তকে পৃথক করে রগের মধ্যে পরিচালিত করে এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায় যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।'

জন্তুর স্তন তার পেটের নিচের দিকে অবস্থিত থাকে। স্তনে রয়েছে পর্যাপ্ত

রক্তনালী। এ রক্তনালী পুরো স্তনে রক্ত সরবরাহ করে আবার স্তন থেকে টেনে নিয়ে হৃদয়ে (হার্টে) স্থানান্তরিত করে। এ সকল রক্তনালীর গা ঘেঁষেই অবস্থান করে স্তনের দুগ্ধনালী। এ সকল নালী থেকে বেরিয়ে আসে নির্ভেজাল খাঁটি দুধ। স্তনের উপরিভাগে থাকে জন্তুর বৃহৎ পেট। তার মাঝে থাকে তার পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, মলভান্ড প্রভৃতি। এগুলোর কাছাকাছি স্থান থেকে আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বেরিয়ে আসে দুগ্ধ। জন্তুর উদরস্থিত বিভিন্ন খাদ্য, পানীয় ও যন্ত্রপাতির সমন্বয় ও সহযোগিতায় দুগ্ধ তৈরি হয়– যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, مِمَّا فِي بُطُونِهِ 'তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে'। যে খাদ্য থেকে গোবর ও রক্ত তৈরি হয় সে খাদ্যই দুধ তৈরীতে সহায়তা করে– যার কারণে আল্লাহ বলেন, 'বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ'।

আল্লাহ একই আয়াতে আরো বলেন, سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ 'যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়'। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে দুধের মত উপাদেয় খাদ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। দুধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। তাই দুধকে বলা হয় আদর্শ খাদ্য।

বিভিন্ন জন্তুর দুধে অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থে ও রংয়ে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গরুর দুধ হালকা সাদা, ক্যাঙ্গারুর দুধ লাল ও মহিষের দুধ গাঢ় সাদা। তবে গুণের দিক দিয়ে দুধে মৌলিক তেমন কোন পার্থক্য নেই। গরুর দুধ, ছাগলের দুধ ও মহিষের দুধের শতকরা ১০০ ভাগ অংশই পানের উপযোগী। গরুর দুধে জলীয়াংশ থাকে ৮৭.৫ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৮৬.৮ গ্রাম ও মহিষের দুধে ৮১ গ্রাম। এর কারণেও দুধ তরল থাকে এবং দুধ কমবেশি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। গরুর দুধে আমিষ থাকে ৩.২ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৩.৩ গ্রাম, মহিষের দুধে ৪.৩ গ্রাম। গরু এবং ছাগলের দুধের আমিষের পরিমাণের পার্থক্য নগণ্য হলেও মহিষের দুধের পার্থক্য একটু বেশি। আমিষ মানব দেহের ক্ষয়পূরণ করে, বৃদ্ধি ঘটায়, পুষ্টি সাধন করে জারক রস, হরমোন, কিছু শক্তি ও তাপ উৎপাদনে সহায়তা করে, রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, মাংসপেশী গঠন করে। আমিষের উদ্ধৃত অংশ শর্করা বা চর্বিতে পরিণত হতে পারে।

গরুর দুধে চর্বির পরিমাণ ৪.১ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৪.৫ গ্রাম. মহিষের দুধে ৮.৮ গ্রাম। গরু ও ছাগলের দুধে চর্বির পরিমাণ কাছাকাছি হলেও মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ বেশি। চর্বি মানব শরীরে শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে, চর্মের

কোমলতা রক্ষা করে। চর্মের মেদ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দুধে বিভিন্ন খনিজ পদার্থও বিদ্যমান। এর হার গরু, ছাগল ও মহিষে একই অর্থাৎ ০.৮ গ্রাম। খনিজ পদার্থ দেহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গরুর দুধে শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ৪.৪ গ্রাম. ছাগলের দুধে ৪.৬ গ্রাম মহিষের দুধে ৫ গ্রাম। শর্করা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে, দেহের ওজন বাড়ায়।

গরুর দুধে ক্যালরির পরিমাণ ৬৭, ছাগলের দুধে ৭২ এবং মহিষের দুধে ১১৭। মহিষের দুধ এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্যালরি সরবরাহ করে। ক্যালরি হচ্ছে শক্তির একক। মানুষ ভিটামিনের অভাবে মারা যায়না, কিন্তু ক্যালরির অভাবে মারা যায়। দুধ ক্যালরি সরবরাহ করে মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এছাড়াও দুধে আরো অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ রয়েছে। গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধে ১৭০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম, ফসফরাসের পরিমাণ গরুর দুধে ৯০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধে ১২০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ১৩০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিন গরুর দুধে ১৭৪ মাইক্রোগ্রাম, ছাগলের দুধে ১৮২ মাইক্রোগ্রাম, মহিষের দুধে ১৬০ মাইক্রোগ্রাম রয়েছে।

সকল দুধেরই সাধারণ গুণ হচ্ছে বলবর্দ্ধক, আয়ুবর্দ্ধক, মেধাবর্দ্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, নিদ্রাকারক এবং ত্রিদোষনাশক। প্রাতঃকালে দুধ পান করলে অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধি ও শুক্র বৃদ্ধি পায়। মধ্যাহ্নে দুধ পান করলে বল বৃদ্ধি পায় ও কফ নাশ হয়। রাতে দুধ পান করলে নানা প্রকার শান্তি বৃদ্ধি হয়। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য সকল বয়সেই দুধ পান করা হিতকর। গরুর দুধ বাত, পিত্ত, রক্তদোষ, হৃদরোগ, বেরিবেরি ও ন্যাফ্রাইটিস রোগে উপকার করে। ছাগলের দুধ মলরোধক। ইহা রক্তাতিসার ও রক্ত আমাশয়ে উপকার করে। মহিষের দুধ রক্তপিত্ত ও দাহ নাশ করে।

দুধ থেকে তৈরি হয় দধি, ঘি, মাখন, পনির, ঘোল প্রভৃতি। নানা প্রকার মিষ্টি ও খাদ্য তৈরিতেও দুধ ব্যবহৃত হয়। এগুলো মানব শরীরের জন্য উপাদেয় ও হিতকর। মিষ্টি দই মধুর রস সরবরাহকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তের শান্তিদায়ক, পুষ্টিকর ও কফনাশক। ইহা মেদ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অম্ল বা টক দই অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত, রক্ত ও কফ বর্দ্ধক, মলরোধক, শোথজনক, পুষ্টিকর ও অরুচি নাশক। ঘি শরীরে চর্বি সরবরাহের এক শ্রেষ্ঠ উৎস। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ থেকে তৈরি সকল ঘি-ই আয়ু বাড়ায়, দেহের দৃঢ়তা

বাড়ায়, শীত নাশ করে, বল বাড়ায়, কাশি, সৌকোমার্য, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত করে। রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, শুক্ররোগে ঘি বিশেষ উপকারী। পুরাতন ঘি আক্রান্ত স্থানে মালিশ করলে ব্যথা-বেদনা ও পুরাতন সর্দি উপশমিত হয়।

ঘোল ত্রিদোষ নাশক, রুচিবর্দ্ধক, শ্রান্তি- ক্লান্তি হরণ কারক, বমন, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, কলেরা, বাত-জ্বর, ন্যাবা, প্রমেহ, উদর ও কোষ্ঠ সংক্রান্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

দুধ প্রকৃতপক্ষে এক উপকারী নিয়ামত। দুধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে মায়ের দুধের প্রসঙ্গও সামনে এসে দাঁড়ায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَاَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ -

"আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।" –সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৩ আয়াত

আল্লাহতায়ালা সূরা আহ্কাফ এর ১৫ নং আয়াতের একস্থানে বলেন,

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

'তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভ ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।' ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কোরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের আলোকে শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস পর্যন্ত শিশুকে স্তন্য দান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে শিশুর জন্ম পরবর্তী আড়াই বছর শিশুর প্রথম এবং প্রধান খাদ্যই থাকে মায়ের দুধ। মায়ের দুধও শিশুর জন্য একটি আদর্শ খাদ্য। শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীবাণু ধ্বংসকারী ল্যাকটোফেরিন, লাইসেজাইম, ইমিউনোগ্লোবিউলিন মায়ের দুধে অবস্থান করে। ল্যাকটোফেরিন কেনডিডা, এলবিকেনস জাতীয় ফাংগাস ও ইকোলাই, সিগেলা জাতীয় জীবাণুর বিস্তৃতি প্রতিহত করে। রক্তে ভাসমান লৌহ কণিকার সংগে যুক্ত হয়ে জীবাণু বেঁচে থাকে ও বিস্তৃতি লাভ করে। মায়ের দুধে লৌহের উপস্থিতি না থাকায় জীবাণু সংক্রমণ প্রতিহত হয়। মায়ের দুধে পলিআনসেচুরেটেড চর্বি বেশি থাকে। এ চর্বি শিশু সহজেই হযম করতে পারে।

শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আবরণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল মায়ের দুধে বেশি থাকে। মায়ের দুধে থাকে দুধের চর্বি হজমের জন্য প্রচুর লাইসেপ জাতীয় এনজাইম। মায়ের দুধে প্রয়োজনীয় ল্যাকটোজ বা শর্করা তো থাকেই, উপরন্তু বিফিডাস ফ্যাক্টর নামক এক ধরনের বিশেষ শর্করা থাকে চল্লিশ গুণ বেশি। তাছাড়াও মায়ের দুধে থাকে পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এসিড, হিস্টিডিন, লিউসিন, থ্রিওনিন প্রভৃতি পদার্থ। মায়ের দুধ যেমন উপাদেয় তেমনি উপকারীও। মা ও শিশুর মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় করে এ দুধ মায়ের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শিশুর বাঁচার উপকরণ এই দুধ। এ দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে শিশু হয় সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান ও উজ্জ্বল। মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের উদরাময়, ফ্লু ও চর্মরোগ হয়না। নিয়মিত দুধ দানকারী মায়ের স্তনক্যান্সারের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

দুধ তা মায়েরই হোক বা চতুষ্পদ জন্তুরই হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত। কোরআন যে দুধের প্রশংসা করেছে, সে দুধ প্রকৃতপক্ষেই মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। কোরআনের কথার সত্যতা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। ফলে দুধ প্রসঙ্গে কোরআন ও বিজ্ঞান আল্লাহর বাণীর সত্যতার প্রতিধ্বনি করে।

- দৈনিক আল মুজাদ্দেদ ঃ ১৮.১.৯৬
- মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ মার্চ '৯৬
- মাসিক অগ্রপথিক ঃ সেপ্টেম্বর '৯৭

যাইতুন ঃ কোরআন হাদীস ও বিজ্ঞানে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ

'এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে।' – সূরা মু'মিনূনঃ ২০ আয়াত

এ আয়াতে স্পষ্ট করে যাইতুন বৃক্ষ বা যাইতুন-এর কথা বলা হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে এখানে যাইতুন বৃক্ষের কথাই বলা হয়েছে। কেননা যাইতুন বৃক্ষ তূর পর্বতেই বহুল পরিমাণে জন্মায়। এই পর্বত যে স্থানে অবস্থিত তার নাম সায়না ও সিনীন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সিনাই পর্বত বলতে সিনীন অঞ্চলের তূর পর্বতকে বুঝিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। এ যাইতুন বৃক্ষ প্রথমে তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কারো কারো মতে নবী নূহের (আঃ) সময়ে যে প্লাবন হয়েছিল তাতে সমস্ত গাছপালা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্লাবনের পর সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল তার নাম যাইতুন। এ যাইতুন থেকেই আহারোপযোগী তেল উৎপন্ন হয়। যাইতুনের তেল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। ব্যঞ্জন বা তরকারী হিসেবে যাইতুন ফল ও তেল উভয়ই সমভাবে সমাদৃত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা নূর-এর ৩৫ নং আয়াতে বলেন,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ
-اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ -اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ -نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ - وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

'আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলুঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ, তাতে পূতঃপবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল প্রজ্জ্বলিত

হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।'

এ আয়াতে আল্লাহ্ যাইতুন তেলকে পূতঃপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। যাইতুন তেল অগ্নিস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু অগ্নিস্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। এসব কথায় যাইতুন তেলের গুণের বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে সূরায়ে ত্বীন-এর ১নং আয়াতেও আল্লাহ্তায়ালা যাইতুনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ "শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যাইতুনের।" ডুমুর ও যাইতুন ফল বা বৃক্ষ যে পরম উপকারী তা আল্লাহর বাণীর গুরুত্ব থেকেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। যাইতুনের বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১। যাইতুন পূতঃপবিত্র।

২। যাইতুন বা যাইতুন তেল ব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ যাইতুন উপকারী খাদ্য হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।

৩। যাইতুন তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়।

৪। যাইতুন তেল প্রজ্জ্বলিত না করলেও তা আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। ফলে ধারণা করা যায় আলোকিত হওয়া মানে রূপ প্রকাশিত করা। তাই রূপ বিকশিত করার ক্ষেত্রে যাইতুন তেলের ভূমিকা থাকতে পারে।

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যাইতুন তেল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা কল্যাণকর বৃক্ষ।' (মাযহারী)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যাইতুন তেল খাওয়া যেমন উপকারী, শরীরে মালিশ করাও তেমনি কল্যাণকর। যাইতুন তেল খাওয়া ও শরীরে মালিশ করা চার কারণে হতে পারে।

(ক) শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধিতে এর কার্যকারিতা থাকতে পারে,

(খ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষেত্রে এর ভূমিকা থাকতে পারে,

(গ) রোগ চিকিৎসায় এর কার্যকারিতা থাকতে পারে এবং

(ঘ) রূপচর্চায় এর প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

এবার কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে যাচাই করে দেখা যাক।

যাইতুন জলপাই এর মত এক ধরনের ফল। খাদ্য হিসেবে যাইতুন বেশ মুখরোচক ও উপাদেয়। কাঁচা অবস্থায় আচার করে, তরকারীতে ব্যবহার করে খাওয়া যায়। যাইতুনের পুষ্টিমানও যথেষ্ট। যাইতুনের মাংসের সমুদয় অংশই আহারের উপযোগী। যাইতুনের ৫৯. ৩% অংশ হচ্ছে জলীয় পদার্থ। জলীয় পদার্থ শরীরে পানি সরবরাহ করে। ফলে যাইতুন ভক্ষণকারীর শরীরে তা পানির চাহিদা পূরণ করতে কিছুটা কার্যকরী ভূমিকা রাখে। শরীরের চার ভাগের তিন অংশই পানি। এ পানির সমতা রক্ষায় যাইতুনের পানি সহযোগী হয়ে কাজ করে। যাইতুনের আমিষের অংশ থাকে ১.৪ ভাগ। আমিষ মানব দেহের ক্ষয়পূরণ করে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। পুষ্টি সাধন করে। জারক রস, হরমোন, কিছু শক্তি ও তাপ উৎপাদনে আমিষ সহায়তা করে। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে রক্ত জমাট বাঁধতে ও মাংসপেশী গঠন করতে আমিষ প্রয়োজনীয়। আমিষের উদ্বৃত্ত অংশ পরিণত হয় শর্করা বা চর্বিতে যা স্বাস্থ্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

শর্করা শরীরের জন্য খুব উপকারী পদার্থ। শর্করা শরীরকে দেয় শক্তি। চর্বি উৎপাদন করতেও শর্করা কাজ করে। যাইতুনে এ শর্করার পরিমাণ ৩৬.২ ভাগ। শক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। এই শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা যাইতুনে রয়েছে ১৫৩ ক্যালরি। যাইতুনে কিছু খনিজ পদার্থও বিদ্যমান যা শরীরের জন্য কোন না কোনভাবে উপকারী। এগুলোর মধ্যে যাইতুনে রয়েছে ২৬ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৩৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৩.১ গ্রাম লৌহ। যাইতুনের পুষ্টিমান দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে যাইতুন ফল খাদ্য হিসেবে শরীরের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপকারী।

যাইতুন থেকে যে তেল উৎপন্ন হয় তা এখন সারা বিশ্বেই বিভিন্ন কারণে সমাদৃত। যাইতুন তেলকে বলা হয় অলিভ অয়েল (Olive oil) । অলিভ অয়েল খাদ্য হিসেবে উপকারী তো বটেই, মালিশের কল্যাণকর সামগ্রী হিসেবেও এর সুনাম সারা বিশ্বে বিস্তৃত।

উন্নত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ভোজ্য তেল হিসেবে যাইতুনের তেল ব্যবহার করে। এটি একটি পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক তেল। এ তেল চর্বিহীন কলেস্টেরল মুক্ত। চর্বি শরীরে অতিরিক্ত হলে মেদ বৃদ্ধি করে, কলেস্টেরল বাড়ায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। যারা ভোজ্য তেল হিসাবে যাইতুন তেল ব্যবহার করে তাদের মেদ বৃদ্ধি পায়না। ফলে আজীবন থাকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম এবং তাদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা

বলেন, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে ভোজ্য তেল হিসেবে অলিভ অয়েল অদ্বিতীয়। স্পেনের অধিবাসীরা ভোজ্য তেল হিসেবে অলিভ অয়েল ব্যবহার করে। এক জরিপে দেখা গেছে, ভোজ্য তেল হিসাবে যাইতুন তেল ব্যবহার করার কারণে স্পেনবাসীদের মধ্যে হৃদরোগীর সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম।

কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ থাকায় অলিভ অয়েল বা যাইতুন তেল বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছেই বিশেষভাবে সমাদৃত। এটি কিছু কিছু রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও তার পারদর্শিতা প্রমাণ করেছে। কান পরিষ্কার, খাৎনা করা, মেয়েদের কান নাক ফোঁড়ানো এবং অন্যান্য অপারেশনের পর ক্ষতস্থান শুকানোর জন্য যাইতুন তেল ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যাইতুন তেলের সাথে রসুনের রস মিশিয়ে মালিশ করলে বাতের ব্যথার উপশম হয়।

গর্ভবর্তী মায়েরা নিয়মিত যাইতুন তেল ব্যবহার করলে তাদের ত্বক ফাটা থেকে রক্ষা পায়। যাইতুন তেল ত্বকের গভীরে গিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। যাইতুন তেলে রয়েছে বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ। এ গুণের কারণে যাইতুন তেল শরীরে মালিশ করলে ত্বকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান আসে। এতে ত্বক হয় পরিচ্ছন, কোমল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। এ অবস্থাটি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বাইরে থেকে শরীরে জীবাণু প্রবেশের ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গোসলের সময় যাইতুন তেল সহযোগে স্তন পরিষ্কার করলে স্তনরোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বোস্টনে প্রকাশিত নতুন এক সমীক্ষার রিপোর্টে জানা যায় যে, যে সব মহিলা অন্তত একবার স্তনে যাইতুন তেল মালিশ করেন তাদের স্তনে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২৫ ভাগ কমে যায়। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর ডঃ দিমিত্রোস ত্রিসোপোলাস দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। দেড় সহস্রাধিক স্তন ক্যান্সার রোগীর উপর তিনি এ সমীক্ষা চালান। তিনি আরো জানান, সারাদিন অন্ততঃ দু'বার স্তনে যাইতুন তেল মালিশ করলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি একেবারেই কমে যায়। শীতের শুকনো ঠান্ডা হাওয়া কচি শিশুদের ত্বক থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। এ আর্দ্রতা কমে গেলে শিশুর ত্বক হয়ে পড়ে রুক্ষ। শিশুর ত্বকের রুক্ষতা দূর করতে এবং এর কোমলতা ফিরিয়ে আনতে যাইতুন তেলের জুড়ি নেই। যাইতুন তেল নবজাত শিশুদের শরীরে মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। এতে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার অর্থই হল শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত হওয়া।

যাইতুন তেল শিশুর স্বার্থে সেই কাজটিই করে থাকে। বার্ধক্য মানুষের সহজাত প্রকৃতি। বার্ধক্য এলে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। রোগে-শোকে পড়েও মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। অপরিমিত আহার বা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও চামড়া কুঞ্চনে সাহায্য করে। স্বামীকে স্ত্রীর কাছে আকর্ষণীয় করে রাখার জন্য এবং স্ত্রীকে স্বামীর কাছে মোহনীয় করে তোলার জন্য রূপচর্চা দূষণীয় নয়। তাছাড়া রোগে-শোকে বা খাদ্যভাবে শরীরের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে পড়লে তা স্বস্থানে ফিরিয়ে নেয়াও অযৌক্তিক নয়। এ উদ্দেশ্যের কার্যাবলীকে রূপচর্চার পর্যায়ে ফেলা যায়। এ ধরনের রূপচর্চার ক্ষেত্রে যাইতুন তেলের ভূমিকা অপরিসীম। মুখমন্ডলে নিয়মিত যাইতুন তেল ব্যবহার করলে মুখের ত্বক পরিচ্ছন্ন হয়। এতে ঘাম নিঃসরণের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় ও দীপ্তি পরিস্ফুট হয়। এখানে কোরআনে উল্লিখিত বাণী 'যাইতুন তেল প্রজ্বলিত না করলেও তা আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী' বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

যাইতুন তেল শরীরে মালিশ করলে ত্বকের শুষ্কতা দূরীভূত করে ত্বককে খস্‌খসে অবস্থা থেকে রক্ষা করে। এ তেলটি শরীরে স্বাভাবিক চর্বি উৎপাদনে সহায়তা করে। স্বাভাবিক চর্বি শরীরে মেদ বাড়ায়না, কিন্তু ত্বককে মসৃণ ও কোমল রেখে ত্বকের কমনীয়তা বৃদ্ধি করে। শরীর সারাদিনে কিছু পরিমাণ তৈলাক্ততা হারায়। যাইতুন তেল ব্যবহারে তা পুনঃ শরীরে ফিরে আসে।

যাইতুন তেল শরীরের রং উজ্জ্বল করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক চা চামচ যাইতুন তেল ও সমপরিমাণ লেবুর রস একত্রে মিশিয়ে সারা শরীরে ঘষে লাগিয়ে আধ ঘন্টা পর নরম তোয়ালে দিয়ে রগড়ে মুছে ফেললে শরীরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। সকল সময় যাদের ত্বক শুষ্ক ও খস্‌খসে থাকে তারা এক টেবিল চামচ যাইতুন তেল ও দু'টেবিল চামচ দুধের সর একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন শরীরে মালিশ করলে কিছু দিনের মধ্যে ত্বকের কর্কশভাব কেটে যাবে।

বার্ধক্য যতই নিকটবর্তী হয় শরীরে ততই বলিরেখার প্রাবল্য দেখা দেয়। বলিরেখার কারণে শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। ডিমের কুসুমের সাথে এক টেবিল চামচ মধু ও এক টেবিল চামচ যাইতুন তেল মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে শুকানোর পর গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে তা তুলে ফেলার কাজটি কিছুদিন করলে বলিরেখা অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

কুসুম গরম যাইতুন তেল ঘষে ঘষে মাথায় মালিশ করে পরিমাণ মত লেবুর রস লাগাতে হয়। তারপর গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখতে হয়। বেশ ক'বার এ রকম করার পর স্যাভলন মিশানো পানি দিয়ে শ্যাম্পু করে চুল শুকিয়ে নিলে খুশকি বা মরামাস দূর হয়। যাইতুন তেলের

সাথে কাঁচা আমলকী মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে ছেঁকে ঠান্ডা করে মাথায় মাখলে চুলপড়া আশাতীতভাবে কমে যায়। অন্যদিকে চুলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তা কাজে আসে।

মেহেদী, টক দই, ডিম ও যাইতুন তেল একত্রে মিশিয়ে মাথায় লাগিয়ে আধঘন্টা পর শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে দিলে চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, চুল হয় সতেজ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মাসে দুবার এরকম করা বিধেয়। এক টেবিল চামচ যাইতুন তেলের সাথে সমপরিমাণ কডলিভার অয়েল মিশিয়ে খেলে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং চুল হয় রেশমী, কোমল, উজ্জ্বল ও সজীব।

যাইতুন ফল বা তেলের গুণাগুণ ইসলাম পূর্ব যুগেও ছিল এক স্বীকৃত সত্য। খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে ক্রীট দ্বীপের নসূস-এর রাজ প্রাসাদে যাইতুন তেল রাখার পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রীস ও রোমানরা প্রাচীন কাল থেকেই গায়ে যাইতুন তেল মাখত। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে রান্না এবং তরকারীতে ভোজ্য তেল হিসেবে যাইতুন তেল ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে যাইতুন বৃক্ষ ছিল আদেশ, শুদ্ধতা, প্রার্থনা, ক্ষমা, আশা এবং স্বাধীনতার প্রতীক। প্রাচীন রাজাদের সম্পত্তির তালিকায় যাইতুন তেলের পরিমাণের প্রাচুর্য থেকে তাদের প্রতিপত্তি নির্ণয় করা হত। প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত যাইতুন হচ্ছে দেবী এথেন্সের উপহার। এ দেবীর নামেই তারা তাদের নগরীর নামকরণ করে 'এথেন্স'। গ্রীক দেশ রক্ষা ও সীমানা চিহ্নিত করতে তারা এক সময় দেশটির চতুর্দিকে যাইতুন বৃক্ষ রোপণ করেছিল।

যাইতুন তেল দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটি খেতে পছন্দ করতেন। যাইতুন বৃক্ষের ডাল দাঁতন বা মেসওয়াক হিসেবে ব্যবহারের রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। যাইতুন বৃক্ষের কাঠ থেকে তসবিহ তৈরির ইতিহাস পাওয়া যায়। যাইতুন বৃক্ষের পাতার দিকে চাইলে মনে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়।

যাইতুন তাই আমদের জন্য এক অতীব উপকারী ফল। যাইতুন বৃক্ষ ও তা থেকে আহরিত তেল মানবের জন্য বিভিন্নভাবে অতি উপকারী বা কল্যাণময় বস্তু। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আমিন।

❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ জুলাই '৯৬

❑ মাসিক আগ্রপথিক ঃ সেপ্টেম্বর '৯৬

❑ মাসিক সওতুল মদীনা ঃ ডিসেম্বর '৯৬

❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ৭.১১.৯৭

পানি ঃ কোরআন ও বিজ্ঞানে

পানি আল্লাহর এক সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। সকল সৃষ্টির জন্যই পানি এক অপরিহার্য উপাদান। পানি ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারেনা। তাই পানির আরেক নাম জীবন।

পৃথিবীর সৃষ্ট জীবের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

'আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি যমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। – সূরা মুমিনুন ঃ ১৮ আয়াত

বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে আকাশে ভাসমান মেঘমালাই হচ্ছে প্রাকৃতিক পানির প্রথম উৎস। মেঘমালা থেকে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষারের আকারে পানি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে আসার পর বৃষ্টির পানির একটি অংশ বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় আকাশে উঠে যায় এবং বাকী অংশের কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ে খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা, জলাশয় ও সমুদ্রে। পানির কিছু পরিমাণ মাটির নিচে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানি হিসেবে পরিচিত হয়। এ সকল পানি ঝর্ণা, নদী-নালা, খাল প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে অপসারিতও হয়।

পৃথিবীতে পানি পাওয়ার তিনটি উৎস রয়েছে। একটি হচ্ছে বৃষ্টির পানি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের পানি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ভূনিম্নস্থ পানি। পানির উৎস বিভাগগুলো কোন নিয়মের অধীন নয়, কেননা তিনটি উৎসের পানিকে আলাদা আলাদাভাবে চেনার তেমন কোন উপায় নেই। পানি হিসাবে সবগুলোই এক। বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠের পানি হিসেবে পরিচিত হতে যেমন বেশি দেরী হয়না, তেমনি ভূপৃষ্ঠের পানিও অতি দ্রুত ভূনিম্নস্থ পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পানির বাষ্পীভবন, বৃষ্টিপাত এবং পৃথিবীতে চলাচল একটি নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পথে পরিচালিত হয়। এ সময়ে পানির গুণাগুণে কিছুটা তারতম্য ঘটে। এ তারতম্যের

মাঝে পানির গুণের হেরফের হয় ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ বা পরিবেশের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

পানির মাঝে বৃষ্টির পানিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। পরবর্তীতে পৃথিবীর পরিবেশ বা মাটির সংস্পর্শে এসে তা দূষিত হয়। খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-জলাশয়ে বৃষ্টির পানি রক্ষিত হয়ে সৃষ্ট জীবের উপকার করার সূত্র তৈরি করে। মাটির নিচ থেকেও পানি ওঠে এ সকল জলাশয়ে অবস্থান নেয়।

পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে পানির প্রধান ব্যবহার হচ্ছে পান করায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?' – সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬৮ আয়াত

আমরা যে পানি পান করি তার মাঝে ভেবে দেখার অনেক কিছুই রয়েছে। পানি তরল পদার্থ। শরীরের শতকরা প্রায় আশি ভাগই পানি। এ পানি বিভিন্ন উপায়ে শরীর থেকে বেরোতে থাকে। পান করে সে অভাব পূরণ করা হয়। শরীরের রক্ত তরল রাখার জন্য পানি অপরিহার্য। তাছাড়া বিভিন্ন রস, হর্মোন, শুক্র প্রভৃতিতেও আনুপাতিক হারে পানি বিদ্যমান।

পানীয় হিসেবে ব্যবহারের পানি বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানির তিনটি গুণ থাকে। বিশুদ্ধ পানির কোন রং নেই, যে পাত্রেই ধারণ করা যায় সে পাত্রেরই রং ধারণ করে। বিশুদ্ধ পানির কোন গন্ধ নেই। বিশুদ্ধ পানির তৃতীয় গুণ হচ্ছে এর কোন পৃথক স্বাদ নেই।

শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের পিপাসা হয়। পিপাসার দরুণ মানুষ পানি পান করে। ফলে শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ হয়। শরীরে পানির পর্যাপ্ত ঘাটতি দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। পানি যে প্রকৃতই জীবন এ থেকে তাই প্রমাণিত হয়। খাবার কিংবা ব্যবহারের পানিতে জীবাণুদুষ্টি ঘটলে দেখা দেয় রোগ-ব্যাধি। কলেরা, আন্ত্রিক জর, আমাশয়, উদরাময়, জন্ডিস প্রভৃতি পানিবাহিত রোগ। এগুলো থেকে খাবার পানির বিষয়ে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

পানির তিনটি রূপ খুব সহজেই লক্ষ্য করার মত। ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি সর্ব্বোচ্চ ঘনত্বে পৌঁছে। এটি পানির তরল রূপ। তাপমাত্রা আরো কমে

গেলে পানি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তখন তার নাম হয় বরফ। এ সময় পানি আয়তনে বর্ধিত হয়। আর এ কারণেই বরফ পানির ওপর ভেসে থাকতে পারে। পানির তৃতীয় রূপটি হচ্ছে বাষ্পীয় রূপ। ভূপৃষ্ঠের পানি সূর্যের তাপে নিয়মিত বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে ওঠে যাচ্ছে। তা ছাড়া রান্নাবান্না বা কলকারখানায় ব্যবহৃত পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে ওঠে গিয়ে মেঘের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। শরীরের পানিও ঘামের আকারে বেরিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে ওঠে যায়।

পানিকে বলা হয় সার্বজনীন দ্রাবক। পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ দ্রবীভূত করতে পানির বিকল্প নেই। আন্যদিকে পানি খুব সহজলভ্য।

পানি মানুষের জন্য অনেক কাজে লাগে। শরীরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পানির প্রয়োজন খুব বেশি। রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা, কৃষিকাজ, গোসল, পবিত্রতা অর্জন প্রভৃতি কাজে পানিই প্রধান উপকরণ। গাছগাছড়ার জীবন ধারণের জন্যও পানি অত্যন্ত প্রয়োজন। আগুন নেভাতে পানির ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পানিতে মানুষের এক প্রধান খাদ্য মাছেরা বিচরণ করে। তা ধরে খেয়ে মানুষ প্রোটিন ও পুষ্টির প্রয়োজন মেটায়। অন্যান্য জলচর প্রাণীও মানুষের অনেক উপকারে লাগে। কোন কোন জলাধারের পানিতে বিভিন্ন উপকারী খনিজ মেশানো থাকে। সেগুলো ব্যবহার করে মানুষ শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। পানি থেকে জলবিদ্যুত উৎপন্ন হয়। পানির উপকারের কথা বলে শেষ করা যাবেনা।

পানি তরল হলেও এটি একটি যৌগিক পদার্থ। এতে রয়েছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন (H_2O)। পানির হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক করে মানুষ তা আলাদাভাবে ব্যবহার করে ভিন্ন উপকার লাভের চেষ্টা করছে। পানি ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে স্থান পরিবর্তন করে পরিবেশ ঠিক রাখছে। এ পদ্ধতি বহাল না থাকলে পৃথিবী পানির তলে ডুবে যেত অথবা পানিশূন্য হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে গতিপথ তৈরী করে আল্লাহ পৃথিবীর জন্য মহা উপকার সাধন করেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে বলেন,

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

'তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি ?' – সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৬৯ আয়াত

আল্লাহর নির্দেশে আকাশে পেঁজা তুলার আকারে ভেসে বেড়ায় মেঘমালা। প্রয়োজন দেখা দিলে সে মেঘমালায় ঠাণ্ডা সঞ্চারিত হয়। ঠাণ্ডার প্রভাবে জমে যায় মেঘ। ফলে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীতে। বায়ু তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। মেঘমালা বেশি ঠাণ্ডায় প্রভাবিত হলে শিলাবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি যাই হোক না কেন, দুটোই পৃথিবীর জন্যে পানির উৎস। তা ছাড়া মেঘমালা থেকে তুষার বা শিশির হয়েও পানি পৃথিবীতে নেমে আসে। আল্লাহই এগুলো বর্ষণ করান।

পানি ভূপৃষ্টে ও ভূগর্ভে জমা হয়। পানি হিসাবে এখানে তাদের কিছুদিন অবস্থান ঘটে। এ পানি বিভিন্ন উপায়ে উত্তোলন করে মানুষ পান করে ও ব্যবহার করে। এ পানি ক্রমাগত সূর্যের আলোয় বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে চলে আকাশের পানে। তারপর মেঘ হয়ে জমে আকাশে। সময়মত বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টির আকারে তা আবার পৃথিবীতে নামিয়ে দেন আল্লাহ তা'আলা। পৃথিবী থেকে বাষ্পীভবন হয়ে যদি পানি আকাশে না উঠত তবে পৃথিবী ডুবে যেত পানির তলায়। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে যদি ঝরে না পড়ত তবে পানিশূন্য হয়ে পৃথিবী হয়ে যেত নিশ্চিহ্ন। আল্লাহ কতই না মেহেরবান। তিনি বলেন ঃ

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ

'আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনা? – সূরায়ে ওয়াকেয়া ঃ ৭০ আয়াত

বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস হলে সমুদ্রের লোনা পানি মিঠা পানির পুকুর, নদী বা জলাশয়ে ঢুকে পড়ে। পানি পর্যাপ্ত বর্ষিত হলে এবং বাষ্পীভবন কমে গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠের পানি বেড়ে যাবে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বর্দ্ধিত হয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর সমুদয় পানি তখন হয়ে পড়বে লবণাক্ত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা যে করছেন না– মানুষের জন্য এটি বড় মেহেরবানী! এ জন্য মানুষের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল!

❑ মাসিক আত তাওহীদ ঃ ডিসেম্বর '৯৬- জানুয়ারী '৯৭

মদ ঃ কোরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে

মদ এক ধরনের নেশাকর পানীয়। ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবভূমিতে পানীয় হিসেবে মদের বহুল প্রচলন ছিল। আরবের অধিকাংশ লোকই তখন মদ পান করত। সাধারণ মানুষ এর বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মদ পান করত। এর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সবার উর্ধ্বে।। তিনি জীবনে কখনো মদ স্পর্শ করেননি। সহাবীগণের মাঝেও এমন কিছু লোক ছিলেন যারা মদ পান করেন নি।

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতিতে অভ্যস্থ থাকায় মদ পান করতেন। আল্লাহর নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়। এরই প্রতিফলন আল্লাহ ফুটিয়ে তুলেন মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।' -সূরা নাহল ঃ ৬৭ আয়াত।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ এ আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মদ্যপান করা ভাল কাজ নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ঠিকই বুঝতে পারে উত্তম আহার্য হিসেবে খেজুর ও আঙ্গুর ফলের উপকারিতা কি এবং এ থেকে তৈরি নেশাকর দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা কতটুকু। আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নেশাকর বস্তু ও উত্তম খাদ্য সম্পর্কে উদ্দীপ্ত করেছেন।

হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর কতিপয় সাহাবী মদ ও জুয়ার অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আযম, হযরত

মা'আয ইবনে জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে তখন একটি আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে; তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। – সূরা বাকারা ঃ ২১৯ আয়াত

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি। এখানে মদের অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। মদ্যপানের দরুণ মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। মদের একটি বড় দোষ হচ্ছে এতে মানুষের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ গুণ বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ আয়াতটিতে এ কারণেই মদ ত্যাগের জন্য এক ধরনের পরামর্শ বিতরণ করা হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হবার পর মদ্যপায়ী সাহাবীদের অনেকেই মদ পান ত্যাগ করেন, কেউ কেউ মদ্যপান বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করতে শুরু করেন।

ইতোমধ্যে একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত দেন। খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি মদপানের ব্যবস্থা করা হল এবং সবাই মদপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং হযরত আলী (রাযিঃ)-কে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি 'কুল ইয়া আউয়্যুহাল কাফিরুনা' সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন। এরপরই মদ্যপান থেকে বিরত রাখার প্রথম নির্দেশ জারী হয়। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেও না যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।' – সূরা নিসা ঃ ৪৩ আয়াত

এ থেকে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। এ নির্দেশ আসার পর অনেকে মদ্যপান ত্যাগ করেন, অনেকে নামাযের সময় এড়িয়ে অন্য সময় মদ পান করা অব্যাহত রাখেন।

কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মানুষ মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ অনুভূতির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ যেন আদেশ অনুসরণ করতে গিয়ে অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন না হয় সেজন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। তাই মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে কোরআনে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোরআনে মদ্যপান প্রসঙ্গে পাঁচখানা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম আয়াতে মদকে বর্জনীয় পানীয় হিসাবে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মদ্যপানের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে সানুষকে সজাগ করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে মদপানের উপর আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। সর্বশেষ আয়াতদ্বয় নাযিল হয়েছে সূরা মায়িদায়। এতে মদ্য পানকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মু'মিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ – এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। – সূরা মায়িদা ঃ ৯০ আয়াত।

মদের অপকারিতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবেনা? – সূরা মায়িদা ঃ ৯১ আয়াত

মদ হারাম করার ব্যাপারে ধীর ও মন্থর গতি অবলম্বন করা বৈজ্ঞানিক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারী করাও ছিল বিজ্ঞতার পরিচায়ক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, 'সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার পরিচায়ক হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।'

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'মদ এবং ঈমান একত্রিত হতে পারেনা।' তিরমিযী শরীফে হুজুর (সাঃ) থেকে হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লানত করেছেন। এরা হচ্ছে ১. যে লোক নির্যাস বের করে, ২. প্রস্তুতকারক, ৩. পানকারী, ৪. যে পান করায়, ৫. আমদানীকারক, ৬. যার জন্য আমদানী করা হয়, ৭. বিক্রেতা, ৮. ক্রেতা, ৯. সরবরাহকারী এবং ১০. এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর মুসলমানদের যাদের কাছে মদ ছিল সবগুলো একস্থানে জড়ো করে ধ্বংস করে দেন। কতকগুলো শরাবের পাত্র তিনি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলেন এবং বাকীগুলো সাহাবীগণের সহযোগিতায় ভাঙ্গান।

সারা বিশ্বে বর্তমানে মদ একটি আকর্ষণীয় পানীয় হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে। অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ এর প্রধান পানকারী হলেও মুসলমান নামীয় এক বিরাট সংখ্যক লোকও এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। অবশ্য সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সমাজ এর অপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে মদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন অনেকেই।

প্রায় সকল মদেই এলকোহল থাকে। নির্দিষ্ট ধরনের শ্বেতসার বা চিনি এর উৎস। মদকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. বিয়ার ঃ এগুলো শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরি করা হয়।

এগুলোতে ৩% থেকে ৭% পরিমাণ এলকোহল থাকে। এগুলো বিয়ার, এলি, পর্টার,স্টাউট প্রভৃতি নামে পরিচিত।

২. স্পিরিট ঃ পাতন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার কারণে স্পিরিট ও অন্যান্য নেশাকর পানীয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পানি ও এলকোহলের আনুপাতিক মিশ্রণকে স্পিরিট বলা হয়। গন্ধবিহীন স্পিরিটকে 'সাইলেন্ট স্পিরিট বলা হয়। স্যাকারিন জাতীয় পদার্থ থেকে স্পিরিট তৈরী হয়। চিনি, গুড় বা ঝোলাগুড়ও কখনো কখনো ব্যবহার করা হয়।

(ক) হুইস্কি ঃ পাতন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ৪৭% থেকে ৫৩%ভাগ এলকোহল সমৃদ্ধ পানীয়ই হচ্ছে হুইস্কি। এটিতে কোন গন্ধ থাকেনা এবং কমপক্ষে দু'বছরের পুরনো হলে ব্যবহার উপযোগী হয়। মল্ট হুইস্কি ও গ্রেইন হুইস্কি নামে এরা দু' প্রকার।

(খ) ব্রাণ্ডি ঃ ব্রাণ্ডি তৈরী হয় আঙ্গুর ফল পাতন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এতে গন্ধ ব্যবহার করা হয়। ব্রাণ্ডিতে ৪৮%থেকে ৫৪% এলকোহল থাকে।

(গ) রাম ঃ ঝোলাগুড় গাঁজিয়ে রাম তৈরী করা হয়। তথাকথিত উৎকৃষ্ট রাম তৈরী করতে চিনি অথবা আখ গাছ ব্যবহার করা হয়। এটি গন্ধযুক্ত রঙ্গিন পানীয়। এতে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ এলকোহল থাকে।

(ঘ) জিন ঃ রাইকে গাঁজিয়ে জিন তৈরী করা হয়। জুনিপার বেরিজ, কার্ডামোমস বা অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে একে গন্ধযুক্ত করা হয়। এতে ৪০% থেকে ৫০% এলকোহল থাকে।

(ল) লিকার ঃ-গন্ধযুক্ত করে আখের রস থেকে লিকার তৈরী করা হয়। এতে ৩৩% ভাগ থেকে ৩৫% ভাগ এলকোহল থাকে।

৩. ওয়াইন ঃ স্যাকারিন ফলের রস গাঁজিয়ে ওয়াইন তৈরী করা হয়। চিনি মিশিয়ে তৈরী করা হয় স্পার্কলিং ওয়াইন। গাঁজানোর বেলায় অন্য যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে থাকে আঙ্গুরের চিনি, ফলের চিনি বা ল্যাভোলুজ, টার্টারিক ও ট্যানিক এসিড। এগুলিতে এলবুমিনাস পদার্থের উপস্থিতি জরুরী। সাধারণ ওয়াইন ১৫% এলকোহল সমৃদ্ধ। ফর্টিফাইড ওয়াইন তৈরী করতে হলে তার সাথে নির্দিষ্ট হারে স্পিরিট মিশাতে হয়।

ওয়াইনের যেগুলোতে ৮% থেকে ১৩% এলকোহল থাকে তার নাম ক্লারেট, এলকোহলের অনুপাত ক্লারেটের বেশি হলে তার নাম হয় বার্গাণ্ডি। আরেক ধরনের ওয়াইনের নাম হক্স। ১৭% থেকে ২২% এলকোহলসমৃদ্ধ

ওয়াইনের নাম শেরী, ১৯-২০% এলকোহল থাকলে তার নাম পোর্ট ওয়াইন, কালো আঙ্গুর থেকে তৈরী ৯% থেকে ১২% এলকোহল সমৃদ্ধ ওয়াইনের নাম শ্যাম্পেইন।

৪. গুড়, ঝোলগুড়, ভাত বা মহুয়া থেকে দেশী উপায়ে গাঁজিয়ে তৈরী করা হয় দেশী মদ। এগুলোতে ৩০% থেকে ৪০% এলকোহল থাকে।

৫. তাল, খেজুর বা নারকেল গাছের রস থেকে গাঁজানো পদ্ধতিতে তাড়ি নামের এক ধরনের মদ তৈরী করা হয়। এগুলোতে ৫% এলকোহল থাকে।

৬. **ভদকা ঃ** রাশিয়ার উৎপাদিত এক ধরনের মদকে ভদকা বলা হয়।

মদ বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করে। স্বাদ ও গন্ধে এদের মাঝে পার্থক্য সহ এলকোহলের পরিমাণেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফলে এর সকল জাতই নেশাজাতীয় পানীয় এবং মদ হিসেবে সবগুলোই হারাম।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

'এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে; তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। – সূরা বাকারা ঃ ২১৯ আয়াত

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে লাবণ্য সৃষ্টি হয়। মদ পাকস্থলীতে পৌঁছে পাকস্থলীর রস নিঃসরণকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে গরমের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর অপকারিতার দিক প্রকৃতপক্ষেই বেশি।

অবিমিশ্র এলকোহল সেবনে খাদ্যের প্রোটিনকে জমাট বাঁধিয়ে ফেলে, পেপসিন ও ট্রিপসিন নিঃসরণ অনিয়ন্ত্রিত বা অকার্যকর করে ফেলে, মিউকাস মেমব্রেনকে উত্তেজিত করে, ফলে আম নির্গত হয় এবং এক্লোরহাইড্রিয়ার উৎপত্তি ঘটে। অজীর্ণ, খাদ্য থেকে ভিটামিন সংগ্রহে বাধাসহ ভিটামিন বি-এর অভাব তৈরি করে পলিনিউরাইটিস এবং পেরিফেরাল নিউরাইটিস উৎপন্ন করে। মদ পান করলে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি লোপ পায় এবং আচার ব্যবহারেও পশুসুলভ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

ক্ষুদ্র মাত্রায় মদ পান করলে প্রথমাবস্থায় কিছুটা পেশীশক্তি বর্ধিত হয় কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তা অবসাদ তৈরি করে। অব্যাহত শ্রমের পর মদ্যপান করলে

সাময়িক আরামের অনুভূতি প্রদান করলেও পরবর্তীতে তা দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি আনয়ন করে।

সীমিত পরিমাণ মদ পান করলে পাকস্থলী তা হযম করে ফেলে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও পানিতে রূপান্তরিত হয়। অন্যান্য খাদ্যের সহযোগী হিসেবে মদ পান করলে চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেটের ব্যবহার সীমিত করে ফেলে এবং পরবর্তীতে কার্বোহাইড্রেট লিভারে গ্লাইকোজেন হয়ে এবং চর্বি কোষকলায় জমা হয়। বারবার ব্যবহৃত হলে মদ শরীরের কোষকলার মারাত্মক ক্ষতি করে। মদ মাতলামীর অবস্থা সৃষ্টি করে ফলে মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় না। নিয়মিত মদ পান করলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। মদ আফ্রিকায় খাদ্যনালীর ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

মদ সামাজিকভাবেও দূষণীয় বিষয়। এটি সামাজিক মারাত্মক সমস্যা তৈরি করে থাকে। শারীরিক ও মানসিক অশান্তি সৃষ্টিতে মদ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে তা পরিবার ও সমাজে ঝগড়া বিবাদ ছড়াতে সাহায্য করে। আল্লাহ্ বলেছেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।' –সূরা মায়েদাহ ঃ ৯১ আয়াত

মদপানকারীদের সুস্থ বিবেক অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। ফলে যে কোন অন্যায়, অবিচার বা দুষ্কর্ম করতে তাদের বাধে না। দেশের সমুদয় অপরাধের চারভাগের তিনভাগ সম্পন্ন হয় মদ্যপায়ীদের মাধ্যমে। মোটরগাড়ীর চালকদের অধিকাংশ দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় মদ্যপানের দরুণ। যৌন কেলেংকারীর সাথেও অধিকাংশ মদ্যপায়ী জড়িত।

মদ আর্থিক ক্ষতিরও অন্যতম মাধ্যম। মদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অপচয় সংঘটিত হয়। এ অপচয় পুষিয়ে তুলতে অথবা মদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দুষ্কৃতকারীরা চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, সন্ত্রাস প্রভৃতি সংঘটিত করে।

মদ প্রকৃতপক্ষেই শারীরিক, মানসিক, সমাজিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ। এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তার বলেছিলেন, 'যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।' –তফসীর আল মানার, মুফতী আবদুহু, পৃঃ ২২৬, জিলদ ২।

বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্থাম বলেন, 'ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আফ্রিকা- ইউরোপে নিষিদ্ধ না থাকায় উন্মাদনা ও জ্ঞান বৃদ্ধির বিবর্তন লক্ষণীয় বিষয়।'

ফ্রান্সের বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ্ ফিল ইসলাম -এ লিখেছেন, 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানকে খতম করার জন্য নির্মিত দুধারী তলোয়ার ছিল এই শরাব। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি, ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠি তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।' –আল জাওহার, আল্লামা তারতাবী (রহ)

যে কোন সৎলোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বঃতস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল, ধ্বংসের উপকরণ। তাই যারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মদ্যপানের সাথে জড়িয়ে গেছেন, তাদের মদ্যপান ত্যাগের জন্য সর্বশেষে রয়েছে একটি সুখবর। আমেরিকার ডাক্তার উইলিয়াম বোরিক এম.ডি. তাঁর পকেট ম্যানুয়েল অব হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় সুখবরটি দিয়েছেন এভাবে, Sulphuric acid mixed with thrice parts of alcohol, ten to fifteen drops three times daily for several weeks, has been successfully used to subdue the craving for liquor, for homeopathic purposes second to thirtieth potency. (এক ভাগ সালফিউরিক এসিডের সাথে তিনগুণ এলকোহল মিশিয়ে প্রতিবারে ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা হিসেবে দিনে তিনবার সেবন করলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মদ্যপানের নেশা দূরীভূত হয়। হোমিও মতে ২ থেকে ৩০ শক্তি ব্যবহার্য।)

- ❑ মাসিক অগ্রপথিক ঃ নভেম্বর '৯৬
- ❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ ডিসেম্বর '৯৬
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১৫.৫.৯৮

ঘুষ ঃ প্রচলিত আইন ও কোরআনে

পবিত্র কোরআনে ইহুদীদের বদভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারা 'সুহত' খাওয়ায় অভ্যস্থ। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। হযরত আলী (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রাঃ), যাহহাক (রহঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ 'সুহত' বলতে 'উৎকোচ' বা ঘুষকে বুঝিয়েছেন।

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা হল, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত সে কাজের জন্য কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী অফিসার বা কর্মচারী তার চাকরীর অধীনে স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারো কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারেন না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে তবে তাও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ্ব, তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি এবাদতও মুসলমানের দায়িত্ব। এ জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। ফেকাহবিদদের মতে কোরআন শিক্ষাদান করা ও নামাযে ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সঙ্গত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয় তবে সে উপরোক্ত গোনাহ্ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। — তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনেও ঘুষকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারায় বলা হয়েছে ঃ কেউ যদি সরকারী কর্মচারী হয়ে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে তার নিজের জন্য বা অপর কোন ব্যক্তির জন্য আইনসঙ্গত পারিশ্রমিক ছাড়া কোন সরকারী কর্ম করার বা পরিহার করার বা কোন ব্যক্তির প্রতি তার সরকারী কার্য পরিচালনার আনুকূল্য প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনে বিরত থাকা অথবা কোন ব্যক্তির সরকার বা আইনসভা

সংশ্লিষ্ট বা কোন সরকারী কর্মচারীর সহিত এতদভাবে সংশ্লিষ্ট কোন হিত বা অহিত সাধনের প্রেরণা বা পুরস্কাররূপে কোন পরিতোষিক গ্রহণ করবে বা প্রাপ্ত হবে বা গ্রহণ করতে সম্মত হবে বা পাবার প্রয়াস পাবে সে তিন বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে এমন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা কারদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয়ভাবে দণ্ডিত হবে।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'তোমরা সুহত থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন।'

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন,

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করোনা এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।' – সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াত

ঘুষ খাওয়া অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার পর্যায়ে পড়ে। তাই তা গ্রহণ করা কারো জন্যই সমীচীন নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন,

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা মুক্তি পাও। – সূরা মায়েদা ঃ ১০০ আয়াত

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও যে উভয়ের মধ্যে দালালী ও মধ্যস্থতা করে।

ঘুষ শুধু মানুষকে ব্যক্তিগত ক্ষতির মধ্যেই টেনে নেয় এমন নয়; ঘুষ সমগ্র দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে বিভাগে অথবা যে দেশে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের ওপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে

কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষিত থাকেনা। তাই ইসলামে ঘুষকে সুহ্ত আখ্যা দেয়া হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। –তফসীরে মারেফুল কোরআন

ঘুষ হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পরও কোন মুসলমান তা গ্রহণ বা প্রদান করতে উৎসাহী হতে পারেনা। অন্যদিকে আইনগতভাবে আমাদের দেশে ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান অপরাধ বলে স্বীকৃত। তবুও এদেশে যেভাবে ঘুষের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে আল্লাহর আযাবে পতিত হওয়ার ভয় সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজ করছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব মণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা– যে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' – সূরা বাকারাঃ ১৬৮ আয়াত

এখানে হালাল পন্থায় অর্জন ও ভোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘুষ ত্যাগ করে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জনের পন্থাটিও এর অন্তর্গত। তেমনি আরো অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, 'তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক। – সূরা নাহল

ঘুষ এক অপবিত্র রোজগারের পন্থা। ঘুষ আল্লাহর আইনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানব রচিত আইনেও ঘুষের প্রতি কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়নি। দেশের আইনের চাইতে আল্লাহর আইন কঠোর। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানের শাস্তি আল্লাহর আইনে ভয়াবহ। এ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

আল্লাহ মুসলমানদেরকে ঘুষের মত হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দিন। আমীন।

❑ মাসিক আত তাওহীদ ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '৯৭

লটারী ঃ কোরআন ও বিজ্ঞানে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ -وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়। যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করোনা বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।
– সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩ আয়াত

সূরা মায়েদার উপরোক্ত তৃতীয় আয়াতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে অনেকগুলো হালাল হারামের মাসআলা উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু লটারী প্রসঙ্গ

নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। আয়াতে হারামের আলোচনায় এটি একাদশ প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে।

জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তীর নিক্ষেপের প্রচলন ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর নির্দিষ্ট করা হত। তাদের একটিতে 'হ্যাঁ', একটি 'না' এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লেখা থাকত। এ তীর কাবার খাদেমের কাছে সংরক্ষিত থাকতো। কেউ নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে বা কোন কাজ করার পূর্বে তার ভাল-মন্দ জানতে চাইলে কাবার খাদেমকে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দবিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে কাজটি উপকারী বা ভাগ্য সুপ্রসন্ন। 'না' শব্দবিশিষ্ট তীর ছিল দুর্ভাগ্যের প্রতীক বা কাজের পক্ষে প্রতিকূল। এ তীরগুলো হারাম মাংস বন্টনের কাজেও ব্যবহার করা হত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হত, কেউ অধিক মাংস লাভ করত।

এ অংশ থেকে আলেমগণ সাব্যস্ত করেছেন যে ভবিষ্যত কথন বিদ্যা বা লটারী হারাম কাজ। কেননা জুয়া অর্থেও কোরআনের আয়াতের সংশ্লিষ্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হযরত ছায়ীদ ইবনে যুবায়ের , মুজাহিদ ও শাবী (রাঃ) বলেন, আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত, পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মত এগুলোও হারাম। – মাযহারী

আল্লাহ এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে পাপাচার ও ভ্রষ্টটা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করোনা তবে আল্লাহকে ভয় কর।'

বিদায় হজ্বের আরাফার দিন উষ্ট্রপৃষ্ঠে রসূলে খোদার (সাঃ) অবস্থানরত অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর একাশি দিন পর রসূলে করীম (সাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন। ফলে আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র নিজেকে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সূরায়ে আনআমের ৫৯ আয়াতে বলেছেন তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানেনা। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরেনা – কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয়না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয়না কিন্তু তা সব প্রকাশ্য

গ্রন্থে রয়েছে। কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্য জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা সে বিষয় কাউকে অবগত হওয়ার ক্ষমতা দান করেননি। (মাযহারী)

আল্লাহ প্রয়োজনে নবীদেরকে অদৃশ্য জগতের কিছু জ্ঞান সরবরাহ করতেন। তখন নবীগণ তা মানুষকে জানাতেন। কিন্তু আল্লাহ সে জ্ঞান সরবরাহ না করলে তাঁদের পক্ষে তা জানা সম্ভব হতোনা।

একসময় মনে করা হতো, জ্বিনেরা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যু এ ধারণার মূলোৎপাটন করে। তিনি জ্বিনদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অসমাপ্ত কাজ করার জন্য নিয়োজিত করে একটি কাচের ঘরে অবস্থান নিয়ে এবাদতে নিমগ্ন হন। লাঠির ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এ অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর এক বছর যাবৎ উইপোকা তাঁর লাঠিটি খেতে থাকে। ফলে এক বছর পর লাঠির দৃঢ়তা কমে গেলে তিনি ভূতলে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু হলেও এক বছর যাবৎ জ্বিনেরা তা জানতে পারেনি। তিনি জীবিত আছেন ভেবে এবং তিনি তাদের প্রতি নজর রেখেছেন মনে করে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বায়তুল মোকাদ্দাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আলামত যখন তারা অনুধাবন করল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা। – সূত্র ঃ সূরায়ে সাবাঃ ৩৪ আয়াত।

মানুষ এমনকি আল্লাহর নবী-রসূলদেরকেও আল্লাহ অদৃশ্য জ্ঞানের ক্ষমতা দেননি, দেননি জ্বিনদেরকেও। ফলে মানুষের পক্ষে অদৃশ্য বিষয়ে কিছু বলা কোনমতেই সম্ভব নয়। বুদ্ধিবৃত্তিধর মানুষ বা জ্বিন যদি অদৃশ্য বিষয়ে কিছু জানাতে অক্ষম হয় তাহলে কিভাবে সম্ভব হবে অজৈব পদার্থ তীর বা এমন কিছুর মাধ্যমে ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা?

এবার যুক্তি প্রমাণের ব্যাখ্যায় আসি। আমাদের দেশে বিশেষ করে রাজধানীতে টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য গণনার একটি কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। বেদেরা সাপ দিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার একটা ফন্দিতেও ভাগ্য প্রসঙ্গে পক্ষে বিপক্ষে কথা বলে। টিয়া পাখির মালিককে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করলে সে টিয়া পাখিটিকে ছেড়ে দেয়। টিয়া পাখিটি ওড়তে পারেনা। সে হেঁটে গিয়ে সাজানো কটি খামের মধ্য থেকে একটি খাম ঠোঁটে করে নিয়ে আসে। এ খামের ভিতর একটা ভাগ্য লেখা থাকে। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার বা অন্য কোন বার অর্থ দিলে টিয়া পাখির মাধ্যমে যে ভাগ্য লেখা বেরিয়ে আসে তা এক রকম

হয়না, হতে পারেও না। তাহলে ভাগ্য পরীক্ষা সত্য হয় কিভাবে? বেদের সাপ একবার যে দর্শকের টাকা মুখে না তুলে দর্শককে ভাগ্যের ব্যাপারে হতাশ করে, পরের বার অথবা অন্য বারের কোন না কোন সময় সে সাপই সে দর্শকের টাকা কামড়ে ধরে। সাপের পক্ষে অন্যের ভাগ্য জানার কি যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে?

এ ধরনের ভাগ্য গণনার লটারী ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার সংগত কারণ আছে। বিষয়টিকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবার যাচাই করা যাক।

মন মানবের এক অশরীরি সত্তা। এই মন মানুষের সকল শক্তির উৎস। মন মানুষের চিন্তা-চেতনাসহ কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমকেও প্রভাবিত এবং পরিচালিত করে। এ কারণেই কার্ল সাগয়ন তাঁর The Dragons of Eden পুস্তকে বলেন, মন হচ্ছে ব্রেন। ব্রেনের কার্যক্রম-এর অঙ্গ ও শরীবৃত্তিয় কার্যাবলীর ফলাফলকেই মনের কার্যক্রম বলে অভিহিত করা হয়। এই মনের শক্তি অসীম। এ অসীম শক্তি তখনই বিকশিত হয় যখন এ শক্তির উপর স্থাপিত হয় বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস। যারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান তারাই সে আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে যুগে যুগে পাল্টে দিয়েছেন ইতিহাস।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় পাওয়া গেছে, মানসিক চাপ আর হতাশা লসিকা কোষের কার্যকারিতার ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে এবং সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে কোন রোগী যদি ধনাত্মক চিন্তা-ভাবনা করে তবে তা শরীরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে অনুকূলে উজ্জীবিত করে এবং তীব্রভাবে রোগের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে রোগ পরাভূত হয়। চিকিৎসা-গবেষকগণ বলেন, বিশ্বাসই কাউকে রুগ্ন অথবা অসুস্থ করে তুলতে পারে, অন্যদিকে বিশ্বাস বা আত্মবিশ্বাস রোগ নিরাময়ে প্রভূত সহায়ক, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একক রোগ-নিরাময়কারী। সূক্ষ্ম গবেষণা থেকে এবং হিপোক্রেটিসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত রোগী সেরে ওঠার হাল-হকিকত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রোগী আর ডাক্তারের আবেগ, চাহিদা ও বিশ্বাস রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

ভাগ্য নির্ধারক শর বা লটারী এ কাজটিই করে থাকে। এগুলো মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে মনকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে তোলে। ফলে মনের শক্তিবলে মানুষ তার কার্যাবলীতে সুফলদায়ক বা বিফলদায়ক পদক্ষেপ নেয় এবং তাতে সফল বা বিফল হয়। লটারী যে ফল প্রদর্শন করে ভোক্তা সে ফলের প্রতি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এটিই তার ভবিষ্যত কার্যাবলীতে অনুকূল বা

প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। প্রকৃতপক্ষে লটারী তার ভাগ্য নির্ধারণ করেনা, ভাগ্যের নির্মাতা সে নিজেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী তাৎপর্যময়। তিনি বলেন, 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।' – সূরা রা'দ ঃ ১১ আয়াত

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ প্রত্যেকের ভাগ্যই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সে ভাগ্যকে মেনে নিলে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করা হয়। ফলে এ বিশ্বাস তাকে অবশ্যই সফল হতে সাহায্য করে । কিন্তু শর বা লটারীর ফলাফলের উপর নির্ভর করলে মন তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সে ফলাফল অর্জনে ব্রতী হয়। এতে সফলতা আসতে পারে আবার বিফলতা বা ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে ওঠতে পারে। কেননা লটারী যেমন সফলতার বাণী প্রদান করে তেমনি বিফলতার বাণীও প্রদান করে – যা মনকে প্রভাবিত করে প্রবলভাবে। অন্যদিকে লটারী আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা থেকে বিরত করে মানুষের মনকে লটারীর ফলাফলের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে – যা শিরক-এর জঘণ্য পথ উন্মুক্ত করে। আল্লাহ মঙ্গলময় একথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে কর্মে প্রবৃত্ত হলে বিফল হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

❑ মাসিক আত তাওহীদ ঃ মে '৯৮

জীবিকা ঃ কোরআন ও হাদীসের আলোকে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

'আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সব কিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।' – সূরা হুদ ঃ ৬ আয়াত

ভূপৃষ্ঠে যারা বিচরণ করে এমন প্রাণীকে 'দাব্বাতুন' বলে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। মোটকথা সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। একথা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ তাআলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এটি এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। কোরআনুল করীমের এ আয়াতে আল্লাহ রিযিকের নিশ্চয়তা বিধান বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা ফরয বা অবশ্য করণীয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর উপর কোন কাজ ফরয হতে পারেনা, কেননা তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না। তবে এতে যে তিনি রিযিকের ব্যাপারে অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের মত করে দায়িত্বের কথা বুঝিয়েছেন– তা অনুমান করা যায়।

প্রত্যেকটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যু বরণ করার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে বলেই এমন হয়। কেউ অসুখে মৃত্যুবরণ করার অর্থ অসুখ-এর মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটান হয়েছে; তেমনি কারো অনাহারে মৃত্যু হওয়ার অর্থ অসুখের বদলে অনাহারের মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটান হয়েছে।

রিযিকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বই আল্লাহর। তাঁর সকল কিছুর ভাণ্ডারই অফুরন্ত। তাই তিনি সে ভাণ্ডার থেকে যাকে খুশি বেশুমার রিযিকও দিতে পারেন। তিনি বলেন,

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘পার্থির জীবনের উপর কাফেরদেরকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন।’ – সূরা আল বাকারা ঃ ২১২ আয়াত। আল্লাহ অন্যত্রও একই কথা বলেছেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘বলুন, ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। – সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬-২৭ আয়াত

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন,

ولقد مكنكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون

'আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।' – সূরা আল আরাফ ঃ ১০ আয়াত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন রুযী বৃদ্ধি করেন তেমনি ইচ্ছা হলে সংকুচিতও করেন। তিনি বলেন,

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য বৈ নয়। – সূরা রাদ ঃ ২৬ আয়াত

সৃষ্টজীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর নিজের। সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টজীবের জন্য যা করেছেন তার বর্ণনা কোরআন শরীফে এভাবে এসেছেঃ

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ - وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ - وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

'আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি।–সূরা হিজরঃ ১৯-২১ আয়াত

আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি বলেন,

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন তিনি প্রবল প্ররাক্রমশালী'। – সূরা আশ শূরা ঃ ১৯ আয়াত

রিযিক অন্বেষণ ঃ

রিযিক আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে রিযিক দেন। তবে সে রিযিক আমাদেরকে অন্বেষণ করে বের করে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' – সূরা আল মুলক ঃ ১৫ আয়াত

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত এমন হতে পারে যে পৃথিবী পৃষ্ঠে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে রিযিক অন্বেষণ করা, পণ্য দ্রব্যের আমদানী রফতানীর মাধ্যমে রিযিক হাসিল করা।

রিযিক প্রশস্ত করার পথ ঃ

আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' – সূরা আল জুমআহ ঃ ৯-১০ আয়াত

জুমআর নামাযের আযান হলে বেচাকেনা বন্ধ করা এবং নামাজ শেষে পুনরায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার ভাবার্থ এও হতে পারে যে নামাযের আজানের পর কাজকর্ম বন্ধ করা ও তারপর জীবিকার

অন্বেষণে যমিনে ছড়িয়ে পড়া বা কাজকর্ম পুনঃ শুরু করার মাঝে জীবিকার প্রশস্ততা বিদ্যমান।

ইবনে কাসীর বলেন, রসূল (সাঃ) তখন জুমআর নামাযের পর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে এখনও সে রীতি প্রচলিত। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের পর খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যান এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন, 'যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।'

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ এ বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া কালবীর যিনি তখন মুসলমান ছিলেন না। সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এ কাফেলা এসেছিল। হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন, সে সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাল ও দুর্মূল্য ছিল। তাই খোতবা শোনা ত্যাগ করে অনেক সাহাবী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এতে যে জীবিকা প্রশস্ত হয়না তার বাণী কোরআনে এভাবে এসেছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا
عِنْدَاللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ *

'তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক দাতা।' – সূরা আল জুমুয়াহ ঃ ১১ আয়াত

আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যে সওয়াব আছে তা এ ধরনের বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে।

এখানে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জুমআর দিন আজান পড়ার পর থেকে জুমায় অংশ গ্রহণ করাসহ খোতবা শোনা ও নামায আদায় করার মাঝে জীবিকার প্রশস্ততা নির্ভরশীল।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'তাওরাত কিতাবে লিখিত আছে ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, ধন-সম্পদ বর্দ্ধিত হোক তার উচিত সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে।' হাকেম আব্বাস (রাঃ) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীতে আরো বলা হয়েছেঃ 'হে আদম সন্তান, আমার এবাদতের জন্য সময় করে নাও। আমি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেব, তোমার দারিদ্র দূর করে দেব এবং যদি তা না কর তবে তোমার বক্ষকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে দেব এবং তোমার দারিদ্র বন্ধ করব না'। তিরমিযি ও বায়হাকি এটি আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, নির্ধারিত রিযিক ঠিক সেভাবেই মানুষকে তালাশ করতে থাকে যেমনিভাবে মৃত্যু তাকে তালাশ করে।' – আবু নঈম।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেন, 'আহারের পূর্বে ওজু দরিদ্রতা এবং আহারের পর ওজু বাজে চিন্তা নিবারণ করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আহারের পূর্বে এবং পরে ওজু দরিদ্রতা নিবারণ করে।'

দারিদ্র থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু এবং তাঁর নবী হযরত রসূলে মাকবুল (সাঃ) যে পথ দেখিয়েছেন তা অনুসরণ করলে দারিদ্র দূরীভূত হবে এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে নিঃসন্দেহে।

জীবিকা সন্ধানের পন্থাঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননা, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে'। – সূরা রা'দ ঃ ১১ আয়াত

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসেনা, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

জাতির জীবনে যে কথাটা প্রযোজ্য, ব্যক্তির জীবনে কি তার ব্যতিক্রম হওয়ার অবকাশ আছে? এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর শিশুপুত্র হযরত ইউসূফ (আঃ)-কে তাঁর সৎ ভাইয়েরা হত্যার উদ্দেশ্যে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হত্যার বদলে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। পরে তিনি আযীযে মিশরের কাছে বিক্রিত হন। আযীযে মিশর তাঁকে নিজ্ স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করেন। একসময় আযীযে মিশরের স্ত্রী জুলায়খা তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল, শুন, তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলল,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ - قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

আল্লাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফল হয়না।' – সূরা ইউসূফ ঃ ২৩ আয়াত

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় জুলায়খা ইউসূফ (আঃ)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। ইউসূফ (আঃ) তার প্রশংসার জবাবে আল্লাহর বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও কঠোরতার বর্ণনা দিয়ে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এ সময় জুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাঁকে পাপকাজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলে বাধ্য হয়ে নিজের চরিত্র রক্ষার খাতিরে তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ

'তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসূফের জামা পিছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল।' – সূরা ইউসূফ ঃ ২৫ আয়াত। ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসূফ (আঃ) দৌড়ে দরজার কাছে পৌছতেই আপনা আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

জুলায়খা দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছিলেন। ইউসূফ (আঃ) সম্ভবতঃ তা জানতেনও। তবু তিনি দৌড়ে তালা পর্যন্ত গেলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন তাঁর সদিচ্ছার প্রতি সাড়া দিয়ে তালা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

এখান থেকে রিযিকের ব্যাপারেও এ সত্য বেরিয়ে আসে যে রিজিক অনুসন্ধানের জন্য মানুষকে তালা পর্যন্ত অর্থাৎ তার রিজিক অন্বেষণে তার সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হবে। ইউসূফ (আঃ) তালার নিকটবর্তী অর্থাৎ তাঁর সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছার পর আল্লাহ 'তালা ' খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তেমনি রিজিক অনুসন্ধানের শেষ সীমায় সামর্থ অনুযায়ী পৌঁছে গেলে আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের সীমানায় না পৌছা পর্যন্ত রিযিক দেননা বলেই অনুমিত হয়। তার প্রমাণ পাই আমরা নিম্নোক্ত কতিপয় হাদীসে।

এ হাদীস আবুবকর ইবনে আয়াশ, হযরত আনিস ইবনে আবিন্নজুদের যার ইবনে হুবায়স থেকে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি উকবা ইবনে আবি মুয়াইতায়ের বকরীর পাল চরাতাম। একবার রসূলে আকরাম (সাঃ) আমার কাছ দিয়ে পথ চলার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ছেলে, তোমার কাছে কি দুধ আছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু তাতো আমার কাছে অন্যের আমানত। তা দেওয়ার অধিকার আমার নেই।'

তিনি বললেন, 'তোমার কাছে কি এমন বকরী আছে যা কখনো গর্ভবতী হয়নি এবং দুধও দেয়নি।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' এমন একটি বকরী তাঁর কাছে পেশ করলাম। তিনি বকরীর দুধের বাঁটে হাত বুলালেন এবং কিছুক্ষণ পানালেন। ফলে বাঁটে দুধ এল এবং তিনি একটি পাথরের বাটিতে তা দোহন করে নিজে পান করলেন ও সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) কে পান করালেন। এমন একটি ঘটনা উম্মে মাবাদের বকরীর বেলায়ও ঘটেছিল। যে বকরী দুর্বল ও অসুস্থ থাকায় দুধ দেয়ার সামর্থ রাখতনা, তার বাঁট থেকে নবী করীম (সাঃ) দুধ দোহন করে উম্মে মাবাদকে দান করেছিলেন, সাথীদেরকে পান করিয়েছিলেন এবং সবশেষে নিজে পান করেছিলেন। পরে পুনরায় দুধ দুইয়ে উম্মে মাবাদকে দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা হিজরতের সফরের সময় ঘটেছিল।

খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন সময় হযরত বশির ইবনে সাআদের পত্নী উমরাহ বিনতে রাওয়াহা স্বামী বশির ইবনে সাআদ ও ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার জন্য দুপুরের খাবার হিসেবে সামান্য খেজুর নিজের কন্যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

রসূলে খোদা (সাঃ) সেগুলো কন্যার হাত থেকে নিজের হাতে নিলেন। তাতে তাঁর হাত ভরলনা। তিনি দস্তরখানে সে খেজুর ছাড়িয়ে দিয়ে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলকে খেতে ডাকলেন। পর্যায়ক্রমে সকলে এসে খেয়ে গেলেও দস্তরখানে শেষে প্রচুর খেজুর থেকে গিয়েছিল।

হাদীসে এমন প্রচুর ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, শূন্য আশার কোন মূল্য নেই। আশার সাথে সাথে একটি উসিলাও প্রয়োজন। নবীজী শূন্য থেকে দুধ তৈরি করেননি, শূন্য থেকে খেজুর সংগ্রহ কনেননি। দুধের জন্য বকরীর প্রয়োজনীয়তা এবং খাদ্যের প্রয়োজন মিটানোর জন্য খেজুরের উপস্থিতি আবশ্যকীয় ছিল। আমরা বলতে পারি, রিযিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে এটি সামর্থের শেষ সীমা। সে সীমায় পৌছে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাতে বরকত দিয়েছেন।

আমাদেরকেও তেমনিভাবে সামর্থ অনুযায়ী জীবিকা অনুসন্ধানের শেষ সীমায় পৌছাতে হবে অতঃপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ রিযিকদাতা, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১৩.২.৯৮

❑ মাসিক আত-তাওহীদ ঃ জুন '৯৮

❑ মাসিক জিজ্ঞাসা ঃ আগস্ট '৯৯

ঘুম ঃ কোরআনে ও বিজ্ঞানে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا

তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য।' – সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৭

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাত দিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সাথে সাথে নিদ্রার কথাও উল্লেখ করেছেন এবং নিদ্রার মাধ্যমে বিশ্রামের জন্য যে সুযোগ প্রদান করেছেন তাও বলে দিয়েছেন। নিদ্রা বিশ্রামের প্রধান নিয়ামক। বিজ্ঞান আল্লাহর এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মানুষের মস্তিষ্কে নিদ্রা বা ঘুমের জন্য আলাদা কোন সেন্টার বা কেন্দ্র নেই। মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে একটি ওয়েকিং সেন্টার বা জেগে থাকার কেন্দ্র। এই জেগে থাকার কেন্দ্রটি যখন কাজ করেনা তখনই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। এই ওয়েকিং সেন্টার বা জেগে থাকার কেন্দ্রটি মস্তকের মেডোলা ও মিডব্রেনের মাঝখানে অবস্থিত।

ওয়েকিং সেন্টার বা জেগে থাকার কেন্দ্রটি যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ মানুষ জেগে থাকে। ওয়েকিং সেন্টারের কাজ করা বা না করার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন সংকেতের মাধ্যমে। শরীর ও মনের ক্লান্তিজনিত কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হরমোন নিঃসরণের মাত্রা কমে আসে। হরমোনের মাত্রা কমতে কমতে একটি নির্দিষ্ট সীমায় এলে ওয়েকিং সেন্টার কাজ বন্ধ করে দেয়। ফলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। ইতালীর বিজ্ঞানী গিয়াসিপ্পে মোরাজ্জি এবং ফরাসি বিজ্ঞানী মিশেল জোভেট ঘুমের ব্যাপারে গবেষণা করে এ তথ্য আবিষ্কার করেন।

ঘুমের গুরুত্ব সম্পর্কে ডাঃ এলান হবসন যে গবেষণা পরিচালনা করেন তার তত্ত্ব 'দি ড্রিমিং ব্রেন' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঘুমের সময় অধিকাংশ মস্তিষ্ক কোষই বিশ্রাম নেয় না। শুধুমাত্র ব্রেনস্টেমের এমিনার্জিক নিওরোনই বিশ্রাম নেয়। এই এমিনার্জিক নিউরোন মনোযোগ ও স্মৃতিরক্ষায় কাজ করে। ফলে একথা অনস্বীকার্য যে, মনোযোগ ও স্মৃতিকে অটুট রাখতে হলে ঘুম অপরিহার্য।

মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিমিত ঘুম তার জন্য প্রয়োজন। পরিমিত নিদ্রা বলতে কতটুকু সময় বা কি রকম ঘুম প্রয়োজন তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের সূরা আল মুমিনুন-এর ৬১ নং আয়াতে বলেন, 'তিনিই আল্লাহ যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা।'

আল্লাহর উপরোক্ত বাণীতে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে যে, তিনি রাতিকে তৈরী করেছেন বিশ্রামের জন্য। প্রায় সকল মানুষই রাতে ঘুমায় এবং এ ঘুম তাকে তৃপ্তিকর বিশ্রাম দেয়। ২৪ ঘন্টার সারা দিনের মাঝে ১০ থেকে ১২ ঘন্টাই রাত্রিকাল। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সারাদিনে সাড়ে ৬ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন। শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি লোক রাতে ঘুমিয়ে এ সময়টুকু ব্যয় করেন। একজন নবজাতক ২৪ ঘন্টার মাঝে ১৮ ঘন্টা ঘুমায় রাতে। শৈশবে মানুষ ১০ থেকে ১২ ঘন্টা ঘুমায়, কৈশোরে ঘুমায় ৮ ঘন্টা। জন্মের কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই মানুষের মাঝে একটানা রাতে ঘুমানোর প্রবণতা জন্মে। শিশুরা রাতে ১২ ঘন্টা বাদেও সকালে ৪ঘন্টা ও বিকালে ৪ ঘন্টা ঘুমায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে তার দিনে ঘুমানোর প্রবণতা কমতে থাকে এবং রাতে ঘুমানোর মাত্রা বাড়তে থাকে। বার্ধক্যে ঘুমের প্রয়োজন অনেক কমে যায়। দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভর করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের ঘুমের মাত্রা কমে। ৩৫ বছর বয়সের পর মহিলারা পুরুষের চাইতে বেশি ঘুমায়। আর সিংহভাগ ঘুমই সংঘটিত হয় রাতে।

ঘুম আসলে একটি শারীরিক অভ্যাস। তাই ঘুমের পরিমাণ মানুষ ভেদে পরিবর্তিত হয়। কেউ ২ ঘন্টা ঘুমিয়েও চমৎকার কাজ করতে পারে। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিনিট চক্ষু মুদেই সারাদিনের ঘুমের প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। আমাদের প্রিয় নবী সর্দারে কায়েনাত হযরত রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন রাত পুরোটাই ইবাদত করে কাটিয়ে দিতেন। এটা যেন মানুষ চিরস্থায়ী করে না নেয় সে জন্য তিনি এক নাগাড়ে অনেক দিন এমন না করে কোন কোন রাত ঘুমিয়েও কাটাতেন। তাই প্রকৃত পক্ষে একজন মানুষের জন্য কতটুকু ঘুম একান্তই প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালাও কোন নির্দেশ দেননি। তবে ঘুমের জন্য যে তিনি রাতকে নির্ধারিত করেছেন তা বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ

তাঁর আরো নিদর্শন রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ, নিশ্চয়ই এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। – সূরা আর রূম ঃ ২৩)

তিনি আরও বলেন,

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' – সূরা আল কাসাস ঃ ৭৩ আয়াত

রাতে ও দিনে নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মাঝে অন্যতম। যে সব সম্প্রদায় মনোযোগী তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী বিদ্যমান। বিজ্ঞান সে নিদর্শনাবলীর কিছু তাৎপর্য খুঁজে বের করেছে।

শিশুরা ঘুমের মধ্যে বড় হয়। বৈজ্ঞানিকরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন ঘুমের মধ্যে শিশুর গ্রোথ হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। এই গ্রোথ হরমোন শিশুকে লম্বা হতে সাহায্য করে। নিদ্রা মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করে, দেহ মনের সজীবতাকে ফিরিয়ে আনে। সারাদিনের ক্লান্তি, দুঃখ, বেদনা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ, হতাশা অনেকটাই চলে যায় রাতে ভাল ঘুম হলে। তৃপ্তিকর ঘুম মানুষের মেজাজ খিটখিটে হওয়া থেকে রক্ষা করে, গা ম্যাজ ম্যাজ করা ভাব প্রতিহত করে, কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি করে মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করে। তাই যারা অনায়াসে গভীর নিদ্রায় ডুবে যেতে পারেন এবং পরিতৃপ্তির সাথে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠতে পারেন, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

দীর্ঘকাল অনিদ্রায় ভোগলে মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ নিদ্রাহীনতায় ভোগে। উন্মাদ লোকেরা দিনের পর দিন নিদ্রাহীন থেকেও ক্লান্ত হয় না। প্রয়োজনীয় ঘুমের অভাবে কাজ-কর্মে মনোযোগহীনতা দেখা দেয়, ঘুম ঘুম ভাব বজায় থাকে, মস্তিষ্কের কাজে শিথিলতা দেখা দেয়।

অকারণে রাগ উঠে, অল্প কাজ বা মানসিক কর্মে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কমে যাওয়ার মত ঘটনাও অনিদ্রার ফলে ঘটে থাকে।

আল্লাহ বলেন, 'তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।' – আনআম ঃ ৯৬ আয়াত। পূর্বে বলা হয়েছে আল্লাহ রাতকে বিশ্রামের জন্য তৈরী করেছেন। এখানে তিনি রাতকে আরামদায়ক করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। রাত আরামদায়ক হওয়ার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে ঘুমও যে সে সব উদাহরণের মাঝে অন্যতম প্রধান একটি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘুমের আরাম প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করেছেন। তাদের প্রাপ্ত তথ্যনুযায়ী ঘুমকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে রেম ঘুম (REM SLEEP) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নন রেম ঘুম (NON REM SLEEP)। রেম ঘুম হচ্ছে Rapid Eye Movement বা দ্রুত চক্ষু সঞ্চালনযুক্ত ঘুম। আর নন রেম ঘুম হচ্ছে দ্রুত চক্ষু সঞ্চালন বিহীন ঘুম। ঘুমের গুরুত্ব হিসেবে এদের নামকরণ করা হয়ছে।

নন রেম ঘুম দিয়ে ঘুমানোর কাজ শুরু হয়। নন রেম স্তর ঘুমের ৭৫ শতাংশ দখল করে রাখে। নন রেম আবার চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে থাকে হালকা ঘুম। দ্বিতীয় অংশে গভীর ঘুমের শুরু হয়। তৃতীয় অংশে ঘুম হয় অপেক্ষাকৃত গভীর। চতুর্থ অংশের ঘুমকে ডেল্টা লেভেলের ঘুম বলা হয়। নন রেম ঘুমে শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া স্বাভাবিক ছন্দে চলতে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। হৃদস্পন্দন ও নিঃশ্বাসের মাত্রা ধীর হয়। রক্তচাপ কম হয়, নাড়ি ধীরে ধীরে চলে। হাত-পায়ের ভঙ্গি বদলে যায়। পায়ের পাতা ও পা ঘন ঘন নড়ে। ডেল্টা অংশে ঘুমন্ত ব্যক্তি ভয়ে জেগে উঠতে পারে।

রেম ঘুম হচ্ছে হালকা ঘুম। এ সময় চোখের তারা নানাভাবে ঘুরতে থাকে। রেম ঘুমের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। এ সময় শ্বাস-প্রশ্বাস-হৃদস্পন্দন ও নাড়ির গতি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। রক্তচাপ উঠানামা করে। পেশী নন রেম ঘুমের চেয়ে বেশি শিথিল হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ের ঘুম গাঢ় থাকে না। ফলে আলতো করে শরীরে স্পর্শ করলে ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে ওঠে। এই স্তরের ঘুমেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। ঘন্টা দেড়েক নন রেম স্তরে ঘুমানোর পর মানুষ ২০ মিনিটের জন্য রেম স্তরে চলে যায়। তার পর আবার শুরু হয় নন রেম স্তর এবং নন রেম স্তর ঘুরে ফিরে আসে। সমগ্র ঘুমের ২৫ শতাংশ জুড়ে থাকে এই রেম স্তর।

ঘুমের জন্যে মস্তিষ্কে আলাদা কোন কেন্দ্র না থাকায় জেগে থাকার কেন্দ্র থেকেই। নিয়ন্ত্রিত হয় নন রেম ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয় জেগে থাকার কেন্দ্রের র‍্যাফ নিউক্লিয়াস থেকে। র‍্যাফ নিউক্লিয়াস-এর তৎপরতা পরিচালিত হয় 'সেরাটোনিন হরমোন'-এর মাধ্যমে। রেম ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয় 'লোকাস সেরুলিয়াস' দ্বারা। লোকাস সেরুলিয়াস-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় 'নন এড্রিনালিন হরমোন' এর মাধ্যমে। ঘুমের বিভিন্ন স্তরে সুষ্ঠু কাজ-কর্মের সামর্থ পরিবর্তিত হয়। রেম ঘুম জেনেটিক প্রোগ্রামকে আচরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মধারা উন্নয়নের অর্থকরী প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করার উপকরণ সরবরাহ করে। রেম ঘুমের ফলেই ব্রেনের সক্রিয় অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ধাপগুলো সম্পন্ন হয়। এতে স্মৃতি সংরক্ষণ, পুরনো ও নতুন তথ্যের তুলনা ও সমন্বয় সাধন হয়। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে ঘুমের মাঝে ব্রেন অত্যন্ত সৃজনশীল থাকে। ঘুমের মাঝেই মানুষ অবচেতনভাবে পুরনো সমস্যার নতুন সমাধান পেয়ে থাকে এবং নতুন ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। স্বপ্নের মাধ্যমে ব্রেন নিজেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ করে ফেলে। ফলে সহজেই অনুধাবন করা যায় ঘুম মানুষের জন্যে আরামদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাই বলেন, 'তিনি রাত্রিকে করেছেন আরামদায়ক।'

ঘুমের সকল বিষয় আলোচনা করলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এতে অসংখ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 'নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (রুম ঃ ২৩) আল্লাহর এই বাণীর সত্যতা এখানে স্বতস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে।

প্রতি রাতের ঘুমের সাথে মৃত্যুর একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তি যেমন সকল জাগতিক বিষয় থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে তেমনি ঘুমের মাঝেও মানুষ কিছুটা হলেও জাগতিক বিষয় থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির আত্মা জাগতিক হারিয়ে ফেলে ঘুমের মাঝেও মানুষ মাঝে মধ্যে জাগতিক অনুভূতি থেকে যৎ সামান্য বিচ্যুত হয়ে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ 'তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ব করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর তা অবগত হন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন যাতে নির্দ্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়।' – সূরা আনআম ঃ ৬০ আয়াত

- দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৫.৪.৯৬
- মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ জুন '৯৬

মানুষ মাটির তৈরী ঃ কোরআন ও বিজ্ঞানে

মানুষ মাটির তেরী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন।

সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানেরা বর্ণ, আকার, চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লাল বর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে। (মাযহারী)

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআনে বেশ ক'টি স্থানে 'মানুষকে যে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, তার কথা উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ

'তিনিই তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।–সূরা আনযাম ঃ ২ আয়াত।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

'আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।' – সূরা হিজর ঃ ১৬ আয়াত

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

'আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানবজাতির পত্তন করব।' – সূরা হিজর ঃ ২৮ আয়াত

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

'হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি।'.. (সূরা হজ্ব ঃ ৫ আয়াত)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।' –সূরা মুমিনুন ঃ ১২ আয়াত

اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ

'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।' –সূরা সিজদা ঃ ৭ আয়াত

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' – সূরা ফাতির ঃ ১১ আয়াত

'তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা,........' – সূরা মুমিন ঃ ৬০ আয়াত

اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

যখন তিনি তোমাদেরক সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে.........' – সূরা নজম ঃ ৩২ আয়াত

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।' – সূরা আর-রাহমান ঃ ১৪ আয়াত

'আল্লাহ বললেন,

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।' – সূরা আল-আরাফ ঃ ১২ আয়াত

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا

'স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর।

তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?' – সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬১ আয়াত

পবিত্র কোরআনে সন্নিবেশিত উপরে প্রদত্ত সমুদয় বাণীই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। এগুলোতে তিনি বার বার বলেছেন যে মানুষকে তিনি মাটি থেকে তৈরী করেছেন। মানুষকে যে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে ইবলিসও সে ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল এবং সে তার সাক্ষ্যও প্রদান করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাকূলকে আদেশ দিলেন তখন ফেরেশতাদের সরদার ইবলিশ সে নির্দেশ অমান্য করে। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী হয়েও আদমকে (আঃ) সেজদা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কেননা তা ছিল আল্লাহর আদেশ। অন্যদিকে আগুনের তৈরী জিন জাতির শ্রেষ্ঠ এবাদতকারী ইবলিস ফেরেশতাদের সর্দার হয়েও আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে বলল, একমাত্র সে অজুহাতে যে, আগুনের তেরী হওয়ায় সে মাটির তৈরী আদম থেকে শ্রেষ্ঠ।

কোরআনে বর্ণিত হওয়ায় মানুষ যে প্রকৃতই মাটির তৈরী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবুও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে যাচাই করলে দেখা যায় কোরআনের সত্যতারই প্রতিধ্বনি করছে বিজ্ঞান।

আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে (সম্ভবতঃ '৭২) সনে ঢাকায় অবস্থিত 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণাগার' (সায়েন্স ল্যাবরেটরী) আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সায়েন্স ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীগণ যে সকল নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছেন সেগুলো জনসাধারণকে দেখানোই ছিল এ প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত অনেক বিষয়ের মাঝে একটি বিষয় হচ্ছে 'মাটি থেকে ঔষধ' আবিষ্কার। মাটিকে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকগণ বারটি ঔষধর কাঁচামাল পৃথক করে নেন এবং এ থেকে বারটি 'বায়োকেমিক' ঔষধ তৈরী করে প্রদর্শনীতে রাখেন। ঔষধগুলো হচ্ছে ক্যালকেরিয়া ফস, ফেরাম ফস, ক্যালি ফস, নেট্রাম ফস, ম্যাগ ফস, ক্যালি মিউর, নেট্রাম মিউর, ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ, নেট্রাম সাল্‌ফ, ক্যালি সাল্‌ফ, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ও সাইলিসিয়া। প্রদর্শনীটি দেখে এসে 'মাটি থেকে ঔষধ শিরোনামের একটি প্রবন্ধ লিখে একটি দৈনিকে ছাপতে পাঠালে তা ছাপা হয়েছিল।

মাটি থেকে ঔষধ পাওয়া গেলে 'মানুষ মাটি থেকে তৈরি হয়েছে' তা কিভাবে প্রমাণিত হয় সে বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার দাবী রাখে। বায়োকেমিক

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঔষুধি চিকিৎসা পদ্ধতি। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত ঔষধগুলো থেকে বারটি ঔষধ পৃথক করে নিয়ে জার্মানীর ডাঃ সুসলার বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির সূচনা করেন। তাঁর মতে, বারটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে মানব শরীর গঠিত। এ পদার্থগুলো শরীরে বিভিন্ন অনুপাতে অবস্থান করে। তাদের অনুপাতে হেরফের হলে দেখা দেয় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি। এই রোগ-ব্যাধি দূরীভূত করার জন্য এই পদার্থগুলোর প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ঔষধ হারাহারি মতে শরীরকে সরবরাহ করতে হয়। এতে পদার্থগুলো সঠিকহারে পুনস্থাপিত হলে রোগ-ব্যাধি সেরে যায়। এতে বোঝা যায় শরীর যে সমস্ত রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থে তৈরী তার সমুদয়ই মাটিতে বর্তমান রয়েছে। ফলে বিজ্ঞান একথা নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছে যে মানবকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানব শরীর বিশেষ কতগুলো অংশের সুষম ও সুনিপুণ সমন্বয়ী সংস্থাপনের মাধ্যমে গঠিত। এ সকল অংশগুলো নানা প্রকার তন্তু বা Tissue দ্বারা নির্মিত। তন্তুগুলো আবার নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্রতম কোষসমূহ দ্বারা। তন্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্থিকোষ (Bone cells), পেশী কোষ (Muscle cells), উপাস্থি কোষ (Cartilage cells), শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি কোষ (Mucous cells), স্থিতিস্থাপক তন্তু (Elastic tissue), উপত্বক তন্তু (Epithelial tissue), সংযোজক তন্তু (Connective tissue), স্নায়ু কোষ (Nerve cells), কেশ (Hair) ইত্যাদি। কোষগুলো আবার জৈব এবং পার্থিব পদার্থ সম্বলিত থাকে। মানবদেহে যে সকল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান সেগুলো হচ্ছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, সালফার, ফসফরাস, ক্লোরিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, সিলিকন, ফ্লোরিন, লিথিয়াম ও ম্যাংগানিজ। এর প্রথম তিনটি পদার্থ শরীরে মৌলিক ও যৌগিক উভয় অবস্থাতেই থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর তন্তু বিভিন্ন কার্যের নিমিত্ত আল্লাহ তৈরী করেছেন, ফলে তাদের মাঝে রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থের উপস্থিতিরও পার্থক্য বিদ্যমান। স্নায়ুকোষে (Nerve cells) ম্যাগনেয়িয়াম ফল ($MgHPO_47H_2O$) ক্যালি ফস ($KHPO_4$), ন্যাট্রাম ফস (Ha_2HPO_4) $12H_2O$), ও ফেরাম ফস (Fe_3 (PO_4 + $Pe(PO_4)_2$) বর্তমান থাকে। পেশী কোষে থাকে ম্যাগ ফস ($MgHPO_4$ $7H_2O$), ক্যালি ফস (K_2HPO_4), নেট্রাম মিউর (Nacl), ক্যালি মিউর (KCL) ও ফেরাম ফস ($FeHFO_4$ + $Fe_3(PO_4)_2$)। সংযোগ

তন্তুতে থাকে সাইলিসিয়া (SiO_2)। স্থিতিস্থাপক তন্তু ধারণ করে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা (CaF_2), অস্থিকোষে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর (CaF_2), ম্যাগনেসিয়াম ফস ও ক্যালকেরিয়া ফস ($Ca_3(PO_4)_2$) থাকে। উপাস্থি ও শ্লৈষ্মিক কোষে নেট্রাম মিউর (Nacl) এবং কেশ ও অক্ষি কোষে অন্যান্য অজৈব লবণসহ লৌহের উপস্থিতি থাকে।

উপরে উল্লেখিত সমুদয় পদার্থই বিজ্ঞানের ভাষায় পার্থিব লবণ। প্রত্যেক পার্থিব লবণের নির্দিষ্ট কার্য আছে এবং প্রত্যেকেরই বিশেষ কতগুলো জৈব পদার্থের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় সে জাতীয় কোষ ও তন্তুর সাথে মিলিত হয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহ নির্মাণ কার্যের সহায়তা করে। তাই বলা হয় উপরে উল্লেখিত সমুদয় লবণগুলোই শরীরের মূল উপাদান। আর এই সমুদয় উপাদানগুলোই মাটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

মানুষকে মাটিতে কবরস্থ করার পর শরীরের মাঝে অবস্থিত লবণগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটির লবণগুলোর সাথে সুষমভাবে মিশে যায়। ফলে দেখা যায় মৃত লাশ কবরস্থ করার কিছুদিন পর তার শরীরের তন্তুগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম দিকে হাড়গুলো অনেকদিন কবরে অবস্থিত থাকলেও ধীরে ধীরে তাও মাটির রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থের সাথে মিশে যায়।

ফলে বিজ্ঞান এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে যে, মানুষের মাঝে যে সকল রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান তার সমুদয়ই মাটির মাঝে রয়েছে। আর তাই মানুষ যে মাটির তৈরী এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি। কোরআন ও বিজ্ঞানের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা নেই।

❑ মাসিক আত তাওহীদ ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯৬

মানব জন্ম রহস্য ঃ হাদীসে ও বিজ্ঞানে

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবদুর রহমান ইবনে আবি হুসাইন আল মক্কী এবং তিনি আছর ইবনে হাওশাবুল আশআরী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীদের কয়েকজন পণ্ডিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এসে তাঁর কাছে চারটি প্রশ্নের জবাব জানতে চাইল। তারা বলল, 'যদি আপনি সঠিক জবাব দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে ঈমান এনে আপনার অনুসরণ করব।' হুযুরে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র শপথ করে তাদেরকে স্বীয় প্রতিশ্রুতিতে আরো দৃঢ় করে প্রশ্ন উত্থাপন করতে বললেন।

তারা প্রথম প্রশ্ন করল, 'শিশু মায়ের সদৃশ কেমন করে হয়, সে তো বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে যা কিনা পুরুষেরই হয়।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর এবং বনী ইসরাঈলের নিকট সংরক্ষিত তাঁর আয়াতের কসম দিয়ে বললেন, 'তোমরা জান যে পুরুষের বীর্য সাদা এবং মহিলাদের বীর্য পাতলা ও হলুদ (বর্ণের) হয়ে থাকে। দু'ধরনের বীর্য মিলিত হলে এর যেটি অপরটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, শিশু সেই বীর্যধারীর সদৃশ হয়ে থাকে।'

তারা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, 'আপনার নিদ্রার অবস্থা সম্পর্কে বলুন।' পুনরায় কসম দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,'আমার চক্ষু নিদ্রা যায় কিন্তু আমার অন্তর জেগে থাকে।' তারাও এ ধারণাই রাখতো। তারা তৃতীয় প্রশ্ন করলো,'আপনি আমাদেরকে বলুন যে, ইয়াকুব (আঃ) তাঁর জন্য কি কি বস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন ?' নবীজী এবারও কসম দিয়ে বললেন,'হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশত এবং দুধ। একবার কোন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করলে শুকরিয়া স্বরূপ তিনি নিজের জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্যগুলো হারাম করে নিয়েছিলেন। তারাও ঘটনাটি এমনই জানতো।

তারা বলল, 'আমাদেরকে জিব্রাইল (আঃ) সম্পর্কে বলুন।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও কসম দিয়ে বললেন,'তোমরা কি জিব্রাইল (আঃ) ও আমার নিকট তাঁর আগমন সম্পর্কে জান ?' তাঁরা বলল,'জি হ্যাঁ, কিন্তু সে তো আমাদের শত্রু। সে কঠোরতার বিধান নিয়ে আসে এবং রক্ত প্রবাহিত করে থাকে। যদি আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমরা আপনাকে অনুসরণ করতাম।'

চারটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন ও তার জবাবে মানব জন্ম রহস্যের এক জটিল প্রসঙ্গের জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন উম্মী নবীর পক্ষে এ ধরনের জটিল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা প্রকৃতপক্ষেই এক অসাধ্য সাধন করার নামান্তর। বছরের পর বছর ধরে গবেষণার পর গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে সে সত্যকেই বিজ্ঞানের সত্যের মতো করে উপস্থাপন করেছেন অবলীলাক্রমে। এটা শুধু যে একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব, তা নবী বিদ্বেষী বৈজ্ঞানিকদেরও স্বীকার না করে উপায় নেই।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিজ্ঞানের যে অনুন্নত পরিবেশ ছিল, তার মাঝে মানব জন্ম রহস্য উন্মোচনের মতো কঠিন ও জটিল বিষয়কে কোনমতেই সহজ সরল করে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না, যদি না আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদ তাতে থাকতো এবং একমাত্র নবী হওয়ার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, 'পুরুষের শুক্র শ্বেতবর্ণ ঘন আঠালো রস বিশেষ। শুক্রকোষ, প্রস্টেটগ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থি নিঃসৃত রস ও অণ্ডকোষ থেকে সৃষ্ট এই শুক্রকীট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটাই বলেছেন যে, 'পুরুষের বীর্য সাদা এবং গাঢ়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'মহিলার বীর্য পাতলা ও হলুদ (বর্ণের) হয়ে থাকে।' একজন পুরুষের পক্ষে স্বীয় বীর্য স্বচক্ষে দেখে তার বর্ণনা দেয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু নারীর বীর্য যে হলুদ তা কিভাবে ১৪০০ বছর আগে বলা সম্ভব? যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাত্র ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডন বেয়ার কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, 'নারীর কোন বীর্য নেই।' বীর্য বলতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যা বোঝায়, তা অবশ্য নারীর নেই। তবে নারীর যৌন মিলনের ফলে উত্তেজনা শেষে যে এক ধরনের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে, তা যে বীর্যের কার্যাবলীর কিছুটা পালন করে, তা বলা বাহুল্য। সে হিসাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সাধারণের জন্য সহজ করে বীর্য বলে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় তখনই যখন তাকে হলুদ বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞান যে বিষয়টিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেছে, তা তিনি দেড় হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছেন।

মহিলাদের শরীরে দু'টো যৌনাধার রয়েছে, যার নাম ডিম্বাধার। এ ডিম্বাধারে

ডিম্ব পরিস্ফুট হয়ে জরায়ুতে স্থান লাভ করে। প্রতি চান্দ্র মাসে সাধারণত একটি ডিম্ব পূর্ণতা লাভ করে এবং ডিম্বকোষকে ফাটিয়ে জরায়ুনালীতে এসে প্রবেশ করে। এর নাম'ওভ্যুলেশন'। ডিম্বগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে ফলিক্‌ল।

সন্তান ধারণের উপযোগী ফলিক্‌ল যখন ফেটে যায়, তখন তার স্থানে সৃষ্টি হয় 'হলদে গঠন'। 'সন্তান সম্ভবা হলে এই 'হলদে গঠন' প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত হয় এবং তা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কাজ পরিপালন করে। এই 'হলদে গঠন' কেটে বাদ দিলে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'ধরনের বীর্য মিলিত হলে এর যেটি অপরটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, শিশু সেই বীর্যধারীর সদৃশ হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের মতে পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর ডিম্ব একত্রে মিলিত হয়ে সন্তানের জন্ম হয়। এ আবিষ্কারটি খুব বেশিদিনের নয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভন হেল্লার ভেড়ির উপর পরীক্ষা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডিম্বকোষ থেকে কোন একটা কিছু জরায়ুতে আগমন করবার ফলেই তথায় ভ্রুণের সৃষ্টি হয়। দেড় হাজার বছর আগে এ তথ্যটা এভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ নিশ্চয়ই ছিলনা।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীদের ধারণার কাছাকাছি বোধগম্য পরিভাষায় 'নারীর শুক্র ও পুরুষের শুক্র মিলনের তথ্যটুকু উপস্থাপন করে যে পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। চৌদ্দশ' বছর পরে যা বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন, তিনি যখন চৌদ্দশ' বছর আগে তা অকপটে বলে দিতে পেরেছিলেন, তখন একথা বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, শুক্র ও ডিম্বের মিলনের তথ্যটিও তাঁর অজানা হয়তো ছিলনা। যেহেতু পুরো জন্ম কর্মকাণ্ডটি আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন আর আল্লাহই তাঁর নবীকে জবাব দেবার জন্য উত্তর বলে দেন, সেখানে সঠিক তথ্য আসাই স্বাভাবিক।

এবার আসা যাক জন্ম বৃত্তান্তে। নারী পুরুষের যৌন মিলনের ফলে নারীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্র একত্রে মিলিত হয়ে জন্ম হয় সন্তানের। নারীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্র এক একটি কোষ বিশেষ। মানব শরীর অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। প্রতিটি কোষে থাকে নিউক্লিয়াস এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসে থাকে ২৩ জোড়া ক্রমোজম। কিন্তু ডিম্ব ও শুক্রকোষ নামের যৌন কোষের প্রতিটিতে থাকে ২৩টি করে একক ক্রমোজম, তার মাঝে একটি হয়ে থাকে যৌন ক্রমোজম।

যৌন 'ক্রমোজমগুলো দু'রকম। বৈজ্ঞানিকগণ এদেরকে 'এক্স' এবং 'ওয়াই' ক্রমোজম নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিটি ডিম্ব মাত্র এক ধরনের ক্রমোজম বহন

করে। অর্থাৎ ডিম্বকোষে থাকে ২৩টি 'এক্স' ক্রমোজম। পুরুষের শুক্রকোষে থাকে দু'ধরনের ক্রমোজম যথাক্রমে 'এক্স' ও 'ওয়াই' ক্রমোজম। শুক্রকোষের 'এক্স' ক্রমোজমের সাথে যখন নারীর 'এক্স' ক্রমোজমের মিলন ঘটে তখন জন্ম নেয় মেয়ে অর্থাৎ এক্স + এক্স = মেয়ে। আবার যখন পুরুষের 'ওয়াই' ক্রমোজমের সাথে নারীর 'এক্স' ক্রমোজমের মিলন ঘটে তখন জন্মায় ছেলে অর্থাৎ এক্স + ওয়াই = ছেলে।

এখানে বলা চলে, নারীর ডিম্বকোষের সমুদয়ই 'এক্স' ক্রমোজম। তার সাথে পুরুষের 'এক্স' ক্রমোজমের মিলন হলে 'এক্স' ক্রমোজমের প্রাধান্য অর্জিত হয়। তাতে জন্ম নিচ্ছে মেয়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেটি প্রাধান্য বিস্তার করে শিশু সেই বীর্যধারীর সদৃশ হয়ে থাকে। অন্যদিকে নারীর 'এক্স' ক্রমোজমের সাথে যদি পুরুষের 'ওয়াই' ক্রমোজমের মিলন ঘটে তবে সেখানে 'ওয়াই' ক্রমোজমের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কেননা 'ওয়াই' ক্রমোজম একমাত্র পুরুষের শুক্রকীটেই থাকে, নারীর শুক্রকীটে থাকেনা। এতে পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য স্বীকৃতি পায় ও সন্তান পুরুষ হিসাবে জন্ম লাভ করে।

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে বিজ্ঞানের যে অমোঘ সত্যবাণী বেরিয়ে এসেছে, তা আবিষ্কার করতে বৈজ্ঞানিকদের সময় লেগেছে প্রায় দেড় হাজার বছর। তারপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেসব বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস স্থাপন করতে কার্পণ্য করে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষায় যে তথ্য বের করতে দেড় হাজার বছর লাগে, সে তথ্য যিনি একক বৈঠকে বিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বলে দিতে পারেন– তিনি তো মহাবৈজ্ঞানিক। এ বৈজ্ঞানিকের প্রতি যাদের আস্থা থাকে না, তারা বৈজ্ঞানিক নামের কলঙ্ক। সত্য আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিকদের কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য প্রচার করেছেন, তা যে মহাবিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করেছে– তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

- ❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ মার্চ '৮৮
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১.৫.৯৮

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্লোনিং

ক্যামেরার ছবির সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। ক্যামেরার ভিতরে ফিল্ম ভরে সাটার টিপে দিলেই ফিল্মে ইপ্সিত কোন ব্যক্তির ছবি উঠে আসে। এবার ফিল্মটিকে স্টুডিওতে নিয়ে ডেভেলপ করালে ছবির একটি নিগেটিভ পাওয়া যায়। এ নিগেটিভ থেকে কাগজে পজেটিভ প্রিন্ট করলে উক্ত ব্যক্তির ছবিটি ফুটে ওঠে। একই নিগেটিভ থেকে যতবার কাগজে পজেটিভ প্রিন্ট নেয়া যাবে, ততবারই উক্ত ব্যক্তিটির একই ধরনের ছবি পাওয়া যাবে। ছবিগুলো একই ব্যক্তির প্রতিকৃতি হলেও এগুলোর কোন জীবন নেই। ক্লোনিং এমন একটি জন্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে ছবির পজেটিভ তৈরীর মত একটি ব্যক্তির অনেকগুলো জীবন্ত প্রতিমূর্তি তৈরী করা যাবে।

দেখতে একইরকম অনেকগুলো জীবন্ত প্রাণী তৈরী করার এই পদ্ধতিটি সারা বিশ্বে এখন তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজুড়ে ক্লোনিং শুধু তোলপাড়ই সৃষ্টি করেছে এমন নয়, জন্ম দিয়েছে নানান বিতর্কেরও। ক্লোনিং পদ্ধতি বিতর্কিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, পুরুষ বিহীনভাবে তাতে সন্তানের জন্মদান। এ পর্যন্তই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করছে। তারপরও বৈজ্ঞানিকরা আরেক ধরনের জন্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন– যাতে সন্তান জন্মাতে নারী-পুরুষের মিলন ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে না। এর নাম টেস্টটিউব বা নলজাতক জন্ম পদ্ধতি। টেস্টটিউব জন্ম পদ্ধতিতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন না হলেও পুরুষের পরোক্ষ ভূমিকা থাকে। পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বাশয়ের পরিস্ফুট ডিম্ব পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে টেস্ট টিউব বা পরীক্ষা নলে নিষিক্ত (বিশেষ ধরনের সম্মিলন) করে যে কোন নারীর জরায়ু বা সন্তান জন্মের থলিতে স্থাপন করা হয়। সেখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমবেশি ৯ মাস ১০দিন) থাকার পর স্বাভাবিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জন্মের এ পদ্ধতি সারা বিশ্বে বিতর্কের ঝড় তুলে যখন কোন কিনারে গিয়ে পৌছেনি, ঠিক তখনি আরেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে জন্মের ভিন্নতর পদ্ধতি ক্লোনিং। ক্লোনিং পদ্ধতিতে একটি প্রাণীর দেহকোষের মাধ্যমে একই ধরনের অকেকগুলো প্রাণীর জন্ম দেয়া সম্ভব যে শিশু প্রাণীগুলো হবে হুবহু ঐ প্রাণীর মত যার কাছ থেকে প্রাথমিক কোষ গ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে নারী-পুরুষের মিলিত ভূমিকা না থেকে সন্তান জন্মদানে যে কোন এক পক্ষের ভূমিকাই যথেষ্ট হয়ে থাকে।

ক্লোনিং এর ইতিহাসঃ

জন্ম নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখাটি গবেষণা করে তার নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এর অধীনে ১৯৫২ সালে দুই বৃটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্লেজ এবং টমাস জে কিং প্রথম ব্যাঙের ক্লোনিং করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৭০ সালে জন গুরচেন সাফল্যের সঙ্গে ব্যাঙের ক্লোনিং করতে সক্ষম হন।

১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম ক্লোনিং-এর ধারণার সূত্রপাত হয়। জার্মান জীববিজ্ঞানী ড. হ্যান্স স্পিম্যান প্রথম ক্লোনিং এর গবেষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে একটি নতুন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং থিওরী বিকাশ লাভ করে। এর নাম 'ইউজিনেক্স থিওরী'। আমেরিকার ফ্রান্সিস গ্যালটন এবং চার্লস ডেভেনপোর্ট এ থিওরিটির জন্ম দেন। এতে বলা হয়, শুধুমাত্র কাম্য গুণগুলোর (Desirable trails) বিকাশ ঘটিয়ে মানব জাতির উন্নয়ন সম্ভব। এর অর্থ হল যে সমস্ত মানুষের জিনে কাম্য বৈশিষ্ট্য আছে, প্রজননের মাধ্যমে শুধুমাত্র তাদেরই বংশবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হবে, বাকিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর উপর নির্ভর করে জার্মানীতে আর্য-জার্মানদের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে ইয়াহুদীদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালে আমেরিকার জন গ্যাভিনের হাতে তত্ত্বটির আরো উন্নতি ঘটে। এর সর্বশেষ পরিণতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৭ সনে স্কটল্যান্ডের মিডলোথিয়ানের রসলিন ইনস্টিটিউটের আয়ান উইলমুটের গবেষণায়। তিনি ছ'বছরের আসন্ন প্রসবা একটি ভেড়ির স্তনের বাঁট থেকে একটি কোষ বেছে নিয়ে তা থেকে ডিএনএ আলাদা করে ফেলেন। অতঃপর অন্য একটি ভেড়ির ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ নিয়ে তার ডিএনএ আলাদা করে পূর্বোক্ত ডিএনএর সাথে নিষিক্ত করিয়ে নতুন এক শিশু ভেড়ি 'ডলি'র জন্ম দিয়েছেন যার চেহারা-ছবি সম্পূর্ণই মাতৃভেড়ির সদৃশ। এ শিশুর জন্মদানে পুরুষ ভেড়ার কোন ভূমিকা ছিলনা, ফলে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর মিলনেরও কোন প্রশ্ন আসেনি। ১৯৯৭ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী এই আবিষ্কারের বিষয়ে নেচার পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ক্লোনিং কিভাবে হয়ঃ

প্রতিটি প্রাণীর দেহ তৈরী হয় একের সাথে আরেকটি কোষ পাশাপাশি সাজিয়ে। প্রতিটি কোষই পৃথক পৃথকভাবে এক একটি জীবন্ত সত্তা। প্রতিটি প্রাণীকোষে দু'ধরনের পদার্থ থাকে। একটির নাম সাইটোপ্লাজম ও অন্যটির নাম নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসে থাকে ২৩ জোড়া সুক্ষ্ম সুতার মত বস্তু বা ক্রমোজম। এই ক্রমোজমের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সর্পিলাকারে প্যাঁচানো থাকে দুই কুন্ডলীযুক্ত ডিএনএ'র আণবিক শৃঙ্খল। ডিএনএ'র পূর্ণাঙ্গ

নাম হচ্ছে ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড। মানব শরীরে ডিএনএ'র মোট পরিমাণ হচ্ছে ২৫০ গ্রামের মত। যদি শরীরের সমুদয় ডিএনএকে বের করে পর পর জুড়ে দেয়া যায় তবে তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় নয়গুণ দূরত্ব অতিক্রম করবে। এই ডিএনএ-ই হচ্ছে বংশগতির ধারক ও বাহক অর্থাৎ এর কারণেই সন্তান পিতা ও মাতার চেহারা-ছবি, গড়ন, চরিত্রসহ অনেক বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে।

প্রতিটি প্রাণীর ডিএনএ আলাদা। মানুষের ডিএনএ-এর সাথে গরুর ডিএনএ'র মিল নেই আর এ কারণেই মানুষ গরুর মত হয় না বা গরু হয় না মানুষের মত। আবার দু'টো মানুষও সম্পূর্ণ এক রকম হয়না এই ডিএনএর (জিনের) পার্থক্যের কারণেই। ডিএনএর আণবিক শৃঙ্খলের এক একটি অংশের নাম জিন। এই জিন কোষের ছোট্ট একটা প্রয়োজনীয় অংশ। জিনের অংশটুকু ছাড়া ডিএনএ'র বাকী অংশ নিষ্ক্রীয় থাকে। প্রতিটি ডিএনএর মধ্যেই আলাদা 'হাউস কিপিং জিন' থাকে। এর কাজ হচ্ছে কোষের প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ করা। কোষের চরিত্র অনুসারে ডিএনএর বাকী অংশটা কাজ করে। ভ্রূণের আদি অবস্থায় ডিএনএর প্রতিটি অংশই কার্যকরী থাকে অর্থাৎ সেই কোষ থেকে শরীরের যে কোন অঙ্গের জন্ম হতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের পৃথক পৃথক ধরনের কোষ নিজেদের আলাদা আলাদা কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং পরে আর সে কাজ থেকে তাদের অন্য কাজে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকেনা।

দু'টো প্রাণী পরস্পর একই রকম হতে গেলে প্রয়োজন তাদের কোষের ডিএনএ একই রকম হওয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা অনুধাবন করলেন, প্রতিটি কোষের ভিন্ন ভিন্ন ডিএনএ ভিন্ন ভিন্ন কাজে জড়িত হয়ে পড়ার দরুণ তাদের চরিত্র বদলে যায়। ক্লোনিং শুরু করার ক্ষেত্রে এটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাধাটিকে তারা নাম দেন 'স্টাম্বলিং ব্লক'। শরীরের কোন অঙ্গের কোন কোষের কোন ডিএনএ নির্দিষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়লে আর অন্য কোন কাজ করতে পারে না। আয়ান উইলমুট এ সমস্যাটা দূর করার পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেলেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোষের ডিএনএর কাজ করবার স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিয়ে তাকে ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন তিনি। এ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্লোনিং-এ সফলতা লাভ করে জন্মাতে সক্ষম হলেন এক নতুন সদৃশ শিশু ভেড়ি ডলি।

ডলির জন্ম প্রক্রিয়াঃ

বৈজ্ঞানিক আয়ান উইলমুট ছ'বছরের আসন্ন প্রসবা ডরসেট গোত্রের একটি ভেড়ির স্তনের বাঁট থেকে কিছু কোষ পৃথক করে নেন। যেহেতু কোষগুলো ছিল বাঁটের, তাই এগুলোর ডিএনএ'র পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই বাঁটের নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করা সম্ভব ছিলনা।

উইলমুট উক্ত কোষ থেকে ডিএনএ'র স্মৃতিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন। এ জন্য তিনি বাঁট থেকে সংগৃহীত কোষগুলোর খাবার কমিয়ে দিলেন। প্রয়োজনীয় খাবারের মাত্র বিশ ভাগের এক ভাগ খাবার কোষগুলোকে দেয়ার ফলে তাদের পুষ্টি গেল কমে। কোষগুলো বেঁচে থাকল বটে, কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হওয়ার কারণে তাদের বিভাজন বন্ধ হয়ে গেল। পাঁচ দিনের মাথায় তারা হয়ে গেল নিষ্ক্রীয়। এর ফলে তারা ফিরে গেল তাদের জন্মের অবস্থায় অর্থাৎ ভ্রূণকোষের কর্মকান্ডে। যে কোষগুলোর ডিএনএ বাঁটের কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল, তারা এবার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দরুণ পূর্বের মত সমুদয় কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এ অবস্থাকে এভাবে পরিস্ফূট করা হয়েছে ঃ Jenes are open to reprogramming of Jene expression. এই সময়ে অন্য প্রাপ্ত বয়স্কা ভেড়ির ডিম্বাশয় থেকে একটি পরিস্ফূট ডিম্বকোষকে পৃথক করে বের করে আনলেন উইলমুট। এ ভেড়িটির জাত ছিল স্কটিস ব্লাকফেস। এবার ডিম্বকোষটি থেকে ডিএনএ সহ নিউক্লিয়াসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলাদা করে নিলেন তিনি। নিউক্লিয়াসবিহীনভাবে ডিম্বকোষটির খোলস পড়ে রইল তখন। সে সময়ে ডিম্বকোষের এ খোলের ভিতর এনে ভরে দিলেন পূর্বে পাওয়া ভেড়ির বাঁট থেকে সংগৃহীত স্মৃতিভ্রষ্ট ডিএনএ-কে। এ অবস্থায় প্রয়োগ করা হল বৈদ্যুতিক স্পার্ক। এতে নিউক্লিয়াসবিহীন ডিম্বকোষটি নিষিক্ত হয়ে ওঠে। এ কাজটি করা হয় প্রবন্ধের প্রথম দিকে উল্লেখিত অনেকটা 'টেস্ট টিউব' পদ্ধতিতে। ছ'দিন নিষিক্ত ডিম্বকোষটিকে টেস্টটিউবে রাখার পর তাকে নিয়ে স্থাপন করা হয় তৃতীয় একটি ভেড়ির জরায়ুর ভিতর। তৃতীয় ভেড়িটি ছিল দ্বিতীয় গোত্রের অর্থাৎ স্কটিস ব্লাকফেস গোত্রের। তৃতীয় ভেড়িটি সন্তান জন্মদানে মুখ্য কোন ভূমিকা পালন করেনি। অর্থাৎ তার জরায়ুতে শুধু নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে প্রাপ্ত ভ্রূণটির বৃদ্ধি ঘটে। জরায়ুতে টেস্টটিউব শিশু বহনকারী তৃতীয় ভেড়িটিকে এক্ষেত্রে বলা হয় সারগোট মাদার বা ভাড়াটে মা। ভাড়াটে মায়ের জরায়ুতে টেস্টটিউব শিশু-ভেড়ি বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে যথা সময়ে প্রসব লাভ করে।

এ শিশু ভেড়িটির মাঝে পাওয়া যায় মা ভেড়ির সমুদয় ডিএনএ। অর্থাৎ যার স্তনের বাঁট থেকে সর্বপ্রথম কোষ সংগ্রহ করা হয়েছিল সে ছিল ফিনডরসেট গোত্রের ভেড়ি আর এখন নবজাতকটিও হল ফিনডরসেট গোত্রের ডিএনএবাহী ভেড়ি। যেহেতু এই ডিএনএ মা ভেড়ির সম্পূর্ণ সদৃশ, তাই এটি দেখতেও হয় মায়ের মতই হুবহু কার্বন কপি। উইলমুটের প্রিয় গায়িকা ডলি পারটনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়ান উইলমুট নবজাতক ভেড়ি-শিশুর নাম রাখলেন 'ডলি'। পৃথিবীতে এ ডলিই হচ্ছে সফল ক্লোনিং করা জীবন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী যাকে

জন্মাতে কোন পুরুষ ভেড়ার সহযোগিতা নেয়া হয়নি। ডলির মা আছে, কিন্তু কোন বাবা নেই। ১৯৯৬ সনের ৫ জুলাই বিকেল ৪টায় ডলি জন্মগ্রহণ করেছিল। ডলির বয়স যখন ১ বছর ১মাস। তখন তার বয়স নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ডলির জন্ম যে কোষ থেকে সে কোষের বয়স ছিল ছয় বসর অর্থাৎ ছ'বছরী ভেড়ি থেকে সে কোষটি নেয়া হয়েছিল। তাই ডলির বয়স আসলে ১ বছর ১ মাস, নাকি ছ'বছর যোগ করে হয়েছে ৭ বসর ১ মাস-এ এক বিতর্কের বিষয়ই বটে।

ভেড়া হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। মানুষও আরেক স্তন্যপায়ী প্রাণী। তাই মনে করা হচ্ছে ভেড়ার ক্লোনিং মানুষের ক্লোনিংকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন এখন ইচ্ছে করলেই ক্লোনিং করে মানুষের জন্ম দেয়া যাবে। মানব ক্লোনিং প্রকৃতই যদি শুরু করা হয় তবে সমাজে নৈতিক, আদর্শিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতোমধ্যে মানুষের জিন ব্যবহার করে স্কটল্যাণ্ডের পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীরা নতুন আরেক ক্লোনিং করা শিশু-ভেড়ির জন্ম দিয়েছেন যার নাম 'পলি'। মানব জিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি নতুন দিক নির্দেশনার সূচনা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ইতোমধ্যেই মানব ক্লোনিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ক্লোনিং সম্পর্কে ইসলামঃ

মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আহমদ হাশেম ওমর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোকে মানব ক্লোনিং বন্ধের জন্য সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মানব ক্লোনিং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য ডঃ ইব্রাহীম সনীদ বলেন, মানব ক্লোনিং অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এর নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করে ফেকাহ্‌বিদ্‌দের কাছে উপস্থাপন করলে এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। মিশরের মুফতী নসরী ফরিদ ওয়াসেল মানব ক্লোনিংকে ধর্ম, বিজ্ঞান ও যুক্তির বিবেচনায় পরিহারযোগ্য বলে মন্তব্য করেন। ক্লোনিং ধর্ম, ব্যক্তি, বংশ বৃদ্ধি ও সম্পদের উপর আঘাত করে মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ বলেন, ক্লোনিং সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এটি অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

সর্বশেষ তথ্য ঃ

মানব ক্লোনিং এর প্রচলন ঘটলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটি দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ করে দেবে। পরিবার প্রথার অস্তিত্ব তখন

আর স্বীকার করার প্রয়োজন পড়বেনা। কায়রো মেডিক্যাল জেনেটিক বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ রসলান উসামা বলেন, মানুষের ক্লোনিং মানব জাতিকে একটি ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে। এটি যৌন জীবনের জন্য বিরাট হুমকি। গর্ভধারণ ক্ষমতার উপর এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। বিন্যস্ত ভ্রুণের গরমিল দেখা দেয়ার কারণে পাঁচ হাজার রোগ জন্ম নেবে। মানব জাতির অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও এটি হুমকি সৃষ্টি করবে।

জনৈক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জনাব ডাঃ হামদী সৈয়দ জানান, ক্লোনিং অব্যাহত থাকলে মানুষ বেচাকেনার পণ্যে পরিণত হবে। আইনুশ শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ডঃ সামিয়া হাসান মানব ক্লোনিংকে সমাজ ও পরিবার ভাঙ্গার হাতিয়ার হিসেবে মনে করেন। কায়রোর সমাজ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাঃ আহমদ মাজদুর মানব ক্লোনিংকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করার সমতুল্য ধারণা করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ একরাম আব্দুস সালাম বলেন, মানব জিনে লুকায়িত ক্যান্সারের জীবাণু ক্লোনিং-এর মাধ্যমে উজ্জীবিত হবে। ফলে ক্যান্সারের প্রসার বাড়বে।

বিশ্বের ৫০টি রাষ্ট্রের ইসলামী ধর্মশাস্ত্রবিদ পন্ডিতেরা গত ৩ জুলাই ১৯৯৭ একযোগে জানিয়েছেন, মানব ক্লোনিং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই অবৈধ এবং ইসলামী নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। জেদ্দায় ইসলামী ফিকাহ্ একাডেমীর ৬ দিনের বৈঠকে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর এ সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়। সৌদি বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আজিজের আহ্বানে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। মুসলিম স্কলারস ফোরামের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আব্দুল্লাহ ওবায়েদ এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

উপসংহারঃ

পশু সম্পদ ও বৃক্ষ সম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারে ক্লোনিং পদ্ধতির ব্যবহার যথেষ্ট ফলদায়ক হতে পারে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্লোনিং সাফল্য লাভ করবে। আমেরিকায় বায়ো টেকনোলজি সেন্টারে বেন সাটনের নেতৃত্বে বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং পদ্ধতির সহায়তায় তিন লক্ষ গাছের এক বৃহৎ অরণ্য তৈরী করেছেন। ফলে মানব ক্লোনিং এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে ক্লোনিং বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

- সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ঃ ১৩.৮.৯৭
- পাক্ষিক পালাবদল ঃ
- মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ অক্টোবর '৯৭
- বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ২৪.১০.৯৭

কোরআনের আলোকে স্তন-ক্যান্সার

মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা স্পর্টিং ডাইজেস্ট-এর আগস্ট '৬৮ সংখ্যার ৬৩ পৃষ্ঠায় সোভিয়েত ক্যান্সার সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ ইলিকজেন্ডার চ্যাকলন মহিলাদের মাঝে ক্যান্সারের প্রসার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইউরোপ-আমেরিকার মহিলাদের হৃদরোগ ও স্তন-ক্যান্সার বৃদ্ধিজনিত কারণে মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি সে প্রবন্ধে পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লিখিত একটি আয়াতের উল্লেখও করেন যেখানে মায়েদেরকে পূর্ণ দু'বছর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, মুসলমানদের মাঝে যারা ধর্মপরায়ণ তারা তো বটেই, সাধারণ ক্ষেত্রে যারা ধর্মবিমুখ তারাও কোরআনের এ আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করেন। এতে করে মুসলমানদের মাঝে স্তন ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য মৃত্যুদূতের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে আমেরিকার মহিলাদের মাঝে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রবণতা প্রায় বিলোপ হয়ে গেছে। সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ানো বর্তমানে এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সারা বিশ্বে তা ছড়াচ্ছে ব্যাপক হারে। সাধারণতঃ এ কারণেই মার্কিন রমণীদের মাঝে বক্ষব্যাধি ও স্তন-ক্যান্সারের দ্রুত সংক্রমণ ঘটছে। বৃটেনে প্রতি বারোজনে ১জন মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

১৯৫৬ সনে আমেরিকায় ক্যান্সার গবেষণার জন্য যে তৃতীয় জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্তন-ক্যান্সারের জন্য সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ানোকে প্রধান কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। এর পরেও অসংখ্য গবেষণায় বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।'

পবিত্র কোরআনে সন্নিবেশিত আয়াত থেকে প্রথমতঃ বোঝা যায়, শিশুকে স্তন্যদান করা মায়ের উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধাবশতঃ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুণ স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।

এতে এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময় সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তন্যের দুধপান করানো চলবেনা। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আব হানিফা (রাহঃ) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ বয়সসীমাকে বর্দ্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম। (তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন, অখন্ড বাংলা, পৃষ্ঠা ১৩০)

শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব,আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। 'মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবেনা। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধপান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে। (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, অখন্ড বাংলা- পৃষ্ঠা ১৩১)

পবিত্র কোরআনের সূরা আহক্বাফের ১৫ নম্বর আয়াতের এক স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।'

সূরা বাক্বারার ২৩৩ নং আয়াতে সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দুধ খাওয়ানো ও গর্ভে ধারণ করতে ত্রিশ মাস সময় ব্যয় করার কথা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) এ থেকে পূর্বের আয়াতের সত্যতা ঠিক রেখে আবিষ্কার করেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। এতে সূরা আহক্বাফের ১৫ নং আয়াতের সাথে এ আয়াতের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব কোরআন শরীফের দুটো স্থানেই সন্তানকে দু'বছর দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের উপর ওয়াজিব দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুলতানা জাহান ১৯৯৫ সনের ১-১৫ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা গেছে যে হাই সোসাইটির মেয়েরা ব্রেস্ট ক্যান্সারে বেশি ভোগে। এর একটি কারণ হতে পারে দেরিতে বিয়ে করা এবং

দেরিতে বাচ্চা নেয়া। এতে করে দীর্ঘদিন ব্রেস্ট কাজ করে না। কর্মজীবি মায়েরা বাচ্চাকে ঠিকমত বুকের দুধ দিতে পারেন না। তাছাড়া পাশ্চাত্য প্রভাবে আজকাল অনেক মাই বাচ্চাকে স্তন্যপান করান না। এসব কারণে এই শ্রেণীর মেয়েদের স্তন-ক্যান্সার হয় বেশি।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্তন-ক্যান্সারের ঝুঁকি গ্রাম থেকে শহর এলাকায় বেশি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে গ্রামের চেয়ে শহরের মহিলারা সৌন্দর্য সচেতন বেশি। ফলে তারা স্তনের সৌন্দর্য রক্ষার অজুহাতে বা বেশিদিন সু গঠিত রাখার কৌশল হিসেবে শিশুদেরকে বুকের দুধ খেতে দেন না। অন্যদিকে শহরের পেশাজীবি মায়েরা কর্মক্ষেত্রে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটানোর দরুণ সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে পারেন না। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিকভাবে গ্রামের মহিলাদের চাইতে শহরের মহিলারা কিছুটা সমৃদ্ধ বিধায় তারা বেশি করে শিশুর জন্য কৃত্রিম খাদ্য কিনে দিতে সক্ষম। তাই কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করে নিজেরা স্তন্যদুগ্ধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন। অপর পক্ষে গ্রামের মহিলারা ততটা সৌন্দর্য সচেতন না হওয়ায় সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন। বংশ পরম্পরায় রেওয়াজ হিসেবে মেনে নিয়ে শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছেন। সারাদিন বাড়িতে অবস্থান করায় দিন রাতের যে কোন সময় সন্তানকে দুধ দিতে পারছেন। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণেও শিশুকে বুকের দুধ ছাড়া বিকল্প কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা না করে স্তন্যদুগ্ধ বিতরণ করেন। ধর্মীয় অনুভূতিও এ ক্ষেত্রে শহরের মহিলাদের চেয়ে গ্রামের মহিলাদেরকে বেশি প্রভাবিত করে রাখে।

আমরা দেখতে পাই আমাদের ডান হাত ও বাম হাতের মাঝে আঙ্গিক কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সকল কাজে ডান হাত ব্যবহার সম্মানজনক হওয়ায় এ হাতটি বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে সে তুলনায় বাম হাতের ব্যবহার তার চেয়ে কম ও সীমিত। ডান হাতকে কাজ বেশি করতে দেয়ায় তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বাম হাত কাজ কম করে বলে তার কার্যক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়না। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও একই কথা খাটে। স্তন একটি অঙ্গ। তাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুধের সঞ্চার ঘটান সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য। এটিই এর বৈধ ব্যবহার। সে ব্যবহার সীমিত করে ফেললে বা একেবারে বাদ দিলে তা যে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে সে কি বলার অপেক্ষা রাখে? কার্যক্ষমতা হারানোর কারণেই স্তনে দেখা দেয় ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি। কবির কথায়,

"যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাধে আসি তারে।"

এখানেও ঘটে তারই প্রতিফলন। অন্যদিকে দেখা যায়, নদীর পানিতে বাঁধ দিলে উজানের দিকে ফুলে ওঠে। ফুলে ওঠা পানিকে চেপে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তাকে তো দাবানো যায়ইনা, বরং যা দিয়ে চাপ দেয়া হয় তাকে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। বুকের দুধও তেমনি স্বাভাবিক নিয়মে বাইরে আসার জন্য তৈরী থাকে, সন্তান সে দুধ পান করলে তা স্তন থেকে বেরিয়ে আসে। স্তন্যদুগ্ধ সন্তানকে খেতে না দিলে তা নদীর স্রোতের মত স্তনের ভিতরে আটকে গিয়ে ফুলে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করে এবং পরিণামে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। কোন রসস্রাবী ফোঁড়ার উপরে প্রলেপ দিয়ে রসস্রাব বন্ধ করে দিলে দেখা যায় তার আশেপাশের অন্য কোন স্থান (যেমন কুঁচকি, বগল প্রভৃতি) ফুলে ওঠে। স্তনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

নারীর বিকশিত স্তন পনেরো বিশটি চর্বিযুক্ত ব্যাসার্ধ আকারে সজ্জিত গ্রন্থিরোয়া দিয়ে তৈরী যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংযোজক কলার চর্বিযুক্ত পাতলা স্তর দিয়ে সংযুক্ত। এর প্রতিটি রোয়া অনেকগুলো অনুরোয়ায় বিভক্ত যার প্রত্যেটিতে রয়েছে দুধের নালী। সরু সরু নালীগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকতর মোটা নালী তৈরী করে। এ মোটা নালীগুলো শেষ পর্যন্ত স্তনের বোটার উপর চার থেকে পনেরটি মুখ নিয়ে প্রকাশ পায়। চার থেকে পাঁচ মাসের গর্ভাবস্থায় স্তন থেকে প্রথম প্রোটোজোলা নামীয় রস নিঃসরণ শুরু হয়। প্রসবের পর রস নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে বেড়ে প্রথম সপ্তাহের শেষে দুধের রূপ ধারণ করে। পস্টিরিয়ার পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে যে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয় তা বুকের দুধ তৈরী করতে সাহায্য করে। আবার অগ্রপিটুইটারী থেকে প্রলাকটিন নামীয় যে স্ত্রী হরমোন নিঃসৃত হয় তাও মেয়েদের স্তনে দুধ আনতে সহায়তা করে।

দুধের মাঝে পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। মায়েদের দুধে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম স্নেহবিন্দু সম্বলিত স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। তাছাড়া প্রোটিন বা কেজেইন, দুধের চিনি বা ল্যাক্টোজ, নানান ধাতব লবণ যেমন সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতিসহ ভিটামিনের উপস্থিতি থাকে। মায়ের শরীরে অবস্থিত এন্টিবডিও মায়ের দুধে অবস্থান করে। ওগুলো শিশুকে অনেকগুলো অসুখ থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হয়। স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা দুধ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ হয়। মায়ের মানসিক অবস্থা দুধ নিঃসরণের কাজকে প্রভাবিত করে। দুধ তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়ার উপর হাইপোফাইসিস, ডিম্বাধার ও অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোনও প্রভাব বিস্তার করে। দুগ্ধবতী মায়েদের দিনে এক থেকে দুই লিটার দুধ নিঃসৃত হয়। সে হিসেবে দুবছরে সন্তান মায়ের দুধ পান করে ১৮ থেকে ৩৬ মণ। অবশ্য শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক মায়ের দুধ নিঃসরণের পরিমাণ কমতে থাকে।

দুধ নিঃসরণের স্বাভাবিক গতি সচল রাখার একমাত্র বৈধ পন্থা হচ্ছে

সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো। পবিত্র কোরআন এ দুধ সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর খাওয়ানোর জন্য বলেছে। এ নির্দেশ লঙ্ঘন করে ক্যান্সারের মত ভয়াবহ ব্যাধির শিকার হলে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

স্তন-ক্যান্সার কি? এক কথায় বলা চলে, কোন ক্যান্সার স্তনে বিকশিত হলেই তাকে স্তন-ক্যান্সার বলা যায়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Every cancer is tumour but every tumour is not cancer, (সকল ক্যান্সারই অর্বুদ, কিন্তু সকল অর্বুদই ক্যান্সার নয়)।

শরীরের কোন অংশ স্বাভাবিকের চেয়ে স্থায়ীভাবে উঁচু হয়ে গেলে তাকে টিউমার বলা হয়। টিউমার দু'ধরনের। এক ধরনের টিউমারকে বলে বিনিং টিউমার, আরেক ধরনের টিউমার হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। সাধারণ টিউমারকে বলে বিনিং টিউমার বা অর্বুদ আর দূষিত বা ক্ষতিকর টিউমারকে বলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ক্যান্সার বা কর্কট রোগ। কোন টিউমারের মাঝে ম্যালিগনেন্সীর দোষ পাওয়া গেলেই তাকে ক্যান্সার বলা হয়। বিনিং টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কোষ (Cell)-এর মাঝে পার্থক্য থাকে। তাই কোন টিউমার ক্যান্সার বলে সন্দেহ হলে তা থেকে কোষ সংগ্রহ করে পরীক্ষা (বায়োপসি) করে ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়।

স্তন-ক্যান্সার শুরুতে নির্ণয় করা বেশ সমস্যাজনক। কারণ একেবারে শুরুতে এটা ছোট একটি শক্ত চাকার মত হয়ে গড়ে উঠে। ব্যথা-বেদনা থাকেনা বলে সহজে রোগীর নজরে আসেনা। পরে বড় হয়ে যখন নিশ্চিত টিউমারের আকার ধারণ করে তখন ক্যান্সারের প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে যায়। আশ-পাশের লসিকা গ্রন্থি বা লিম্ফগ্লান্ডগুলো ততদিনে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন চিকিৎসাও বেশ জটিল হয়ে পড়ে।

স্তন-ক্যান্সার অধিকাংশ সময়ই স্তনের ভিতর অবস্থান নেয়। ফলে বাইরে থেকে তা দেখা নাও যেতে পারে। তবে টিপলে তা হাতে অনুভূত হয়। স্তনের টিউমার নিরূপণের জন্য ম্যামোগ্রাম জরুরী। এটি এক ধরনের এক্সরে প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে স্তনের ভিতর সন্দেহজনক কোন বস্তু থাকলে তা সনাক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ মার্টিন বার্কের মতে, 'ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে স্তনের ভিতরে সর্বনিম্ন আধা সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের গুটিকা বা চাকার উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব।' ম্যামোগ্রাম করার পর স্তনে কোন গুটিকার উপস্থিতি টের পাওয়া গেলে সেখান থেকে চিকিৎসক যন্ত্রের সাহায্যে টিউমার বা গুটিকার কিছু কোষ সংগ্রহ করেন এবং তা পরীক্ষা করে ক্যান্সার নির্ণয় করেন।

স্তন-ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে কখনো কখনো তা শরীরের অন্যান্য অংশেও

ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাধারণতঃ ফুসফুস, লিভার ও হাড় এতে আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় স্তন-ক্যান্সারের আকৃতি দুই ইঞ্চির চেয়ে বড় হয়, স্তন ফুলে ওঠে, স্তনে টোল পড়ে, ক্যান্সারটির চারপাশের চামড়া লাল ও গরম হয়ে ওঠে।

স্তন-ক্যান্সার হলে স্তন থেকে ক্যান্সার সরিয়ে ফেলাই নিরাপদ চিকিৎসা। অস্ত্রোপচার বা তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা যায়। শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে ক্যামোথেরাপি এবং হরমোন থেরাপির সাহায্য নেয়া যায়। বর্তমানে তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমী অথবা ল্যামপেকটমী পদ্ধতিতে স্তন-ক্যান্সারের সন্নিহিত এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

স্তন-ক্যান্সারের ক্ষতিকারক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তাকে কয়েকটি স্তরে সনাক্ত করা হয়। স্তরগুলোকে স্টেজ বলা হয়। কারসিনোমা ইন সিটু বা শূন্য স্টেজ হল স্তন-ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে চিকিৎসা নিলে শতকরা ৯৫ জনই আরোগ্য হয়। টিউমারের ব্যাস ২ সেন্টিমিটার বা তার কাছাকাছি হলে তাকে স্টেজ ১ বলা হয়। টিউমার ৫ সেন্টিমিটার বা বেশি হলে স্টেজ ৩ ধরা হয়। এ সময় ক্যান্সারে ক্ষত ও পূঁজ দেখা দেয়। চিকিৎসায় তার শতকরা ৪১ ভাগ উপকার লাভ সম্ভব। স্টেজ ৫ হচ্ছে স্তন ক্যান্সারের অনড় অবস্থা। এ পর্যায়ে চিকিৎসা শুরু হলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা মাত্র ১০ শতাংশ।

বংশে কারো স্তন ক্যান্সার থাকলে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। স্তন-ক্যান্সারে আক্রান্ত মায়ের কন্যা ও বোনদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। বংশগত ক্যান্সার সাধারণতঃ কম বয়সেই আক্রমণ করে বসে।

স্তন-ক্যান্সার একটি জটিল ব্যাধি তাতে সন্দেহ নেই। এটি প্রতিরোধের জন্য মহিলাদের নিজেদেরই সচেতন হতে হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি কথা আছে, Prevention is better than cure প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে শ্রেয়। তাই আক্রান্ত হওয়ার আগে প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া মহিলাদের কর্তব্য। সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করে স্তন ক্যান্সারের অধিকাংশই প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ পালন করে সন্তানকে পুরো দু'বছর বুকের দুধ খাওয়ানোর মাঝে নিহীত রয়েছে মায়েদের স্তন-ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকার উপায়। আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের সকলকে এ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

- ❑ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান অক্টোবর '৯৬
- ❑ পাক্ষিক পালাবদল ঃ ১৬.৫.৯৭
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ৩১.৭.৯৮

এইডস্ ঃ কোরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে

বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবচাইতে ঘৃণিত অবৈধ যৌনকর্ম হচ্ছে পুংমৈথুন বা সমকামিতা। নবী হযরত লূত (আঃ)-এর সময়ে সমাজে সমকামিতার প্রসার ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ - فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ - وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ

‘আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। তার সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও তাদেরকে শহর থেকে। এরা সাধু থাকতে চায়। অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী! সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল– যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখ গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।’ – সূরায়ে আল আরাফ ঃ ৮০-৮৪ আয়াত

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِينَ - قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا - قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ - إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلٰى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

'আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছে, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন, যদি তুমি সত্যবাদী হও। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। যখন আমার ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের (আঃ) কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করব। নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা যালিম। সে বলল, এই জনপদে তো লূত (আঃ) রয়েছে। তারা বলল ঃ সেখানে কে আছে তা আমরা ভাল করেই জানি। আমরা অবশ্যই তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে।' – সূরায়ে আল-আনকাবুত ২৮-৩৪ আয়াত

আযাব প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ -

'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি উক্ত জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম। –সূরায়ে হুদ ঃ ৮২ আয়াত

হযরত লূত (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। পশ্চিম ইরাকের অন্তর্গত বসরার নিকটবর্তী বাবেল শহরে তাঁদের বাসস্থান ছিল। আল্লাহর পথে আহ্বান জানালে স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আঃ) ছাড়া আর কেউ যখন মুসলমান হলেন

না, তখন নির্যাতনের মুখে বাধ্য হয়ে তাঁরা বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরে কেনানে হিযরত করেন। লূত (আঃ) নবুয়াত প্রাপ্ত হলে আল্লাহর নির্দেশে জর্দান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনে নিয়োজিত হন। উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূমি সাদূমে পর্যাপ্ত ফল-ফসল উৎপাদনের কারণে এলাকাবাসীরা অতি সুখে থেকে হযরত লূত (আঃ)-এর উপদেশে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু পুংমৈথুনের মত সমকামিতায় তারা লিপ্ত হয়- যা একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার ও যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করেও যখন লাঞ্ছিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল হল। আল্লাহর নির্দেশে হযরত লূত (আঃ) পরিবার-পরিজন ও সৎকর্মশীলদের নিয়ে শেষ রাতে সাদূম ত্যাগ করার সাথে সাথেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা প্রস্তর বৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাদূমের অধিবাসীদের ধ্বংস করে দেন এবং জনপদটি সম্পূর্ণ উল্টে দেন।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক লূতের কওমের মত অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর। – তাফসীরে মা'রিফুল কোরআন, অখন্ড বাংলা ৬৪১ পৃষ্ঠা

সমকামিতা যে কত জঘন্য অশ্লীলতা তার প্রমাণ পাওয়া যায় পশুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই। পশুদের মাঝে সমকামিতার কোন স্থান নেই। অথচ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মাঝে এ অশ্লীলতা প্রসার লাভ করছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বের সর্বোন্নত দেশ বলে খ্যাত আমেরিকায় সমকামিতাকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সমকামিতা প্রসারের সাথে সাথে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এক ছোটখাট গযব– যা মানুষের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনছে। 'এইডস' নামক মারাত্মক প্রাণঘাতি ব্যাধিটির জন্ম হয়ছে সমকামিতা থেকে। পৃথিবী জুড়ে এইডস-এর যে দুর্দান্ত প্রতাপ এবং তার ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য করলে একে আযাব বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা হয় না।

১৯৮৬ সালের ২৫শে জুলাই আমেরিকার বিখ্যাত চিত্রতারকা রড হার্ডসন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার ব্যাধিটির কোন চিকিৎসা ছিল না। ব্যাধিটি তখনই প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ে। ব্যাধিটির ইতিহাস খুঁজে দেখা যায় এর জন্ম হয়েছে সমকামিতার মাধ্যমে। রড হার্ডসন পুংমৈথুনে অভ্যস্থ একজন সমকামী ছিলেন। ব্যাধিটিকে কোন রোগের

সংজ্ঞায় ফেলতে না পারার দরুণ এর নাম দেয়া হয় এইডস্।

১৯৮১ সালে আফ্রিকার সবুজ বানরের রক্তে প্রথম এইডস্ ভাইরাস পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। দু'তিন দশকের মধ্যে তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে এবং মানবদেহে বিস্তার লাভ করে বলে মনে করা হয়।

এই মারাত্মক ব্যাধিটি আফ্রিকার কালো মানুষের মাঝে প্রথমে বিস্তার লাভ করে, পরে তা সাদা মানুষের মাঝে প্রসার লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ডাঃ রবার্ট স্ট্রিকার বলেন, আমেরিকার ফোর্ড ডেরিকে সামরিক ও জীবানু অস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রে ভুল গবেষণার ফসল হিসেবে এইডস্-এর জীবাণু আবিষ্কৃত হয়।

কারাবন্দীদের উপর এর দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা চালানো হয়। এ ব্যাপারে সি আই এ বিস্তারিত তথ্যাবলী গায়ব করে দিয়ে নির্জলা সত্যকে চাপা দিয়েছে এবং সবুজ বানরকে এইডস-এর প্রথম জীবাণুবাহী বলে মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়েছে।

১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট এইডস-এর ভাইরাস প্রথম চিহ্নিত করেন। এটির কৃত্রিম উৎপাদন সম্ভব। প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট এর নাম রাখে Lymph Adenopathy Associated Virus (LAV), মার্কিনীরা এর নাম দেন Human T Lymphocyte Virus Type iii (HTLV-iii)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ভাইরাসটির নাম দেন Human Immune Deficiency Virus (HIV)। এই অঞ্চলে ভাইরাস আবার তিন ধরনের। যথা HIV-1, HIV-2, FMA HLT-V. এদের কারণে মানব শরীরে যে রোগটির বিস্তার ঘটে তার নাম এইডস্ (AIDS)

এইডস্ একটি মারাত্মক ব্যাধি। আজ পর্যন্ত এর কোন চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয়নি। এইডস্ ভাইরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অবসান ঘটায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অবনতি ঘটলে শরীর কোন রোগকে বাধা প্রদান করতে পারে না। ফলে শরীরে রোগ স্থায়ী আসন গেঁড়ে নেয়। রক্তের মাঝে এক বিশেষ ধরনের কোষ থাকে যার নাম লিম্পোসাইট। এ কোষ রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। টি হেলপার নামে অন্য কোষগুলো এ কোষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। HIV ভাইরাস এই টি হেলপার কোষের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এদের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে সম্প্রসারিত হয় এইডস্। এইডস্ এর পুরো নাম AIDS=AQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

IMMUNITY বা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আল্লাহ্ প্রদত্ত এক নিয়ামত। শরীরে যে কোন রোগ জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে শরীরের ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা তাকে প্রতিরোধ করে। ফলে শরীরে সে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে না। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে শরীরে রোগের প্রসার ঘটে। আল্লাহ্র বিশ্বে এমন ঔষধ সৃষ্টি করা হয়েছে যার ব্যবহারে যে কোন রোগ প্রতিরোধ বা দূর করা যায়। কিন্তু এইডস্ এর ব্যতিক্রম। এইডস্ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে খুব দ্রুত ধ্বংস করে দেয়। পরিণামে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সমকামিতার মাধ্যমে HIV বা এইডস্ জীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করে। HIV বাহকদের সাথে যৌন মিলন ঘটালে সুস্থ ব্যক্তিও এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এভাবে এইডস ভাইরাস বহনকারী স্বামী থেকে স্বাভাবিক যৌন মিলনে স্ত্রী এইডস্-এর কবলে পড়ে। ড্রাগ গ্রহণকালে ইঞ্জেকশনের সুঁইয়ের মাধমে এ জীবাণু অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে। HIV জীবাণুবাহী রক্ত কারো শরীরে সঞ্চালন করলে তারও এইডস হয়। এইডস্ আক্রান্ত মায়ের গর্ভজাত শিশু এইডস নিয়ে জন্মায়। সুঁই, ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করার দরুণ এইডস্ আক্রান্তদের কাছ থেকে দাঁতের ডাক্তার, নার্স এবং সার্জনদের এইডস্ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এইডস্ আক্রান্ত রোগীদের কাঁপুনী দিয়ে জ্বর হয়, মাথা ব্যথা হয়, বমন হয়, প্রশ্রাব হলদে হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির চোখের রেটিনার উপর তুলোর সাদা দাগ পড়ে। চোখে দৃষ্টিকটু স্ফীতি দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির লসিকাগ্রন্থি ফুলে যায়। রাতে ঘাম ঝরানো জ্বর দেখা যায়। উদরাময় দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে ওজন হ্রাস পায়। অবসাদ এসে রোগীকে কাবু করে ফেলে।

রোগ ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হয়। তখন মুখে ও গলায় ঘা দেখা দেয়। যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস, হার্পিস বিস্তার লাভ করে, ক্যাপোসিস সার্কোমা নামের ক্যান্সার উৎপন্ন হতে পারে। এইডস দেখা দেওয়ার প্রথম অবস্থায় রক্তে p24 নামের এন্টিজেন বেড়ে যায়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা আবার নেমেও যায়। এ সময় শরীরে এন্টিবডি বেড়ে যায় ও রোগের লক্ষণ সুপ্ত হয়ে পড়ে। সুপ্তাবস্থা ১০ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকতে পারে। এরপর এন্টিবডি কমা শুরু হয় এবং p24 দ্রুত বাড়তে শুরু করে। এন্টিবভি কমে যাওয়ার অর্থ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যাওয়া। এতে রোগী খুব দ্রুত কাবু হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

Engime Linked Immuno Sorbing Assay সংক্ষেপে এলিজা পরীক্ষায় HIV ভাইরাস অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা সম্ভব হয় না বলে সাধারণ পরীক্ষায় এইডস্ সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। রোগ ধরা পড়লে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকেনা।

চিকিৎসা শাস্ত্রে "Prevention is better than cure: আরোগ্যের চাইতে প্রতিরোধ শ্রেয়' বলে একটি প্রবাদ আছে। এইডস্-এর বেলায় প্রবাদটি শতকরা একশভাগ সত্যি। সমকামিতা ত্যাগ করা বা এতে অভ্যস্ত না হওয়া, বহুগামী না হওয়া, বারবনিতাদের সংস্পর্শে না যাওয়া, এইডস্ আক্রান্তদের সাথে যৌনমিলন না ঘটানো, রক্ত পরিসঞ্চালনে সাবধান থাকা, বিদেশ থেকে আসা রক্তজাত দ্রব্য প্লাজমা, সিরাম ইত্যাদি ব্যবহার না করা, ইঞ্জেকশন নিয়ে নেশা ত্যাগ করা, এক সুঁই বহুজনে ব্যবহার না করা, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রভৃতি হচ্ছে এইডস্ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

ইসলাম পুংমৈথুনের মত কর্মকে জঘন্যতম অশ্লীল বলে ঘোষণা করেছে। নারীর সাথে অবৈধ যৌন মিলনকে ইসলামের পরিভাষায় যেনা বা ব্যভিচার বলা হয়। এটি একটি ঘৃণ্য শাস্তিমূলক কর্ম। কিন্তু সমকামিতাকে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই যেনার চাইতেও জঘন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেনার প্রসারে সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর যে আযাব নেমে আসে তার চাইতে বহুগুণ কঠিন আযাব নেমে আসার সম্ভাবনা থাকে সমকামিতার প্রসার লাভ করলে। তাই কনডম ব্যবহার করে অবৈধ যৌনকর্ম করলে এইডস্-এর কবল থেকে মুক্ত থাকার শ্লোগান এ কথার নিশ্চয়তা দেয় না যে, তা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবে!

তাই শেষ কথা হচ্ছে, মরণ ব্যাধি এইডস্ -এর কবল থেকে তথা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র পন্থাই হচ্ছে ইসলামের নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। আমীন॥

- ❑ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ঃ ১৮.১০.৯৫
- ❑ দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২.২.৯৬
- ❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ মাচ '৯৭
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ৫.১২.৯৭

উপদংশ দর্শন ও ইসলাম

আইন যাকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে তার জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন মাত্রার অপরাধের জন্য বিভিন্ন মাত্রার শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। সামাজিকভাবে সংগঠিত কিছু অপরাধের জন্য প্রকৃতি নিজেই কিছু শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। এ ধরনের একটি অপরাধ হচ্ছে যৌন অপকর্ম। একটি বিশেষ ধরনের যৌন অপকর্মের জন্য প্রকৃতি বিশেষ ধরনের একটি শাস্তি নির্দিষ্ট করেছে। শাস্তিটির নাম উপদংশ (সিফিলিস)। ট্রিপোনেমা প্যালিডাম নামের এক ধরনের জীবাণু উপদংশ নামের অসুখটির জন্ম দেয়। উপদংশ রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির সাথে সুস্থ কোন ব্যক্তির যৌন মিলন ঘটলে তার মাঝে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে এবং লোকটি নতুন করে উপদংশ রোগে আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপনকারী কোন লোকের কখনো উপদংশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে যার মাঝে উপদংশ রোগের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়, তার মাঝে অন্যত্র থেকে উপদংশের জীবাণু সংক্রমণ ঘটেছে বলে বুঝতে হবে।

একজন সৎ স্ত্রী বা পুরুষ উপদংশ আক্রান্ত কোন স্ত্রী বা পুরুষের সাথে বৈধ বিবাহিত জীবন যাপন করে উপদংশে আক্রান্ত হতে পারে। তবে এতে এটি অনস্বীকার্য যে, এদের একজন উপদংশের জীবাণু বহনকারী অন্যজনের সাথে অবৈধ যৌন মিলন ঘটিয়ে এ জীবাণু নিজের মাঝে আহরণ করেছে অথবা উপদংশে আক্রান্ত ব্যক্তিটি নিজেই এমন কারো সাথে অবৈধ যৌন মিলন ঘটিয়েছে যার মাঝে উপদংশের জীবাণু ছিল। ফলে একথা সর্বতোভাবে স্বীকৃত যে, উপদংশ একটি অবৈধ যৌন কর্মের ফসল। তাই এটি একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। ব্যাধিটি একটি অপরাধজনক কর্মের ফল।

ধারণা করা হয় এদেশে ব্যাধিটির প্রসার ঘটেছে ইংরেজদের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজরা এটি এদেশে ছড়িয়েছে। ইংরেজদেরকে তখন বলা হত ফিরিঙ্গি, আর সে কারণেই ব্যাধিটিকে ফিরিঙ্গি ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করা হয়। তারা অবৈধ যৌন কর্মের মাধ্যমে এদেশে যাদের মাঝে এর প্রসার ঘটিয়েছে তাদের কাছ থেকে এ দেশীয়রা এ রোগটি নিজেদের মাঝে বিস্তার ঘটিয়েছে।

এ রোগটি প্রসারের তিনটি পর্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী। উপদংশের জীবাণু কারো শরীরে যৌন মিলনের মাধ্যমে প্রবেশ করে। শরীরে প্রবেশের পর ১০ দিন থেকে ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত জীবাণুটি সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। পরবর্তীতে যৌনযন্ত্রে এক বা একাধিক ফুস্কুরীর মত পীড়কা দেখা দেয়। তাতে কোন ব্যথা-বেদনা থাকেনা। এটি

কোনরূপ উপদ্রবও সৃষ্টি করে না। ১২ দিন থেকে ৪২ দিন পর্যন্ত এই প্রাথমিক অবস্থা বিরাজ করে। কখনো কখনো তা ২০০ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

উপদংশের প্রাথমিক অবস্থা প্রকাশ পেলে রোগী ব্যতিরেকে অন্য কারো জানার উপায় নেই যে তার এ রোগ হয়েছে। বাইরে থেকে অবশ্য কেউ রোগের লক্ষণ দেখতে পায় না। গোপন অঙ্গে প্রকাশ পাওয়ার দরুণ তা গোপন থাকে এবং ব্যথা-বেদনা না থাকায় অন্যের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় চিকিৎসা না হলে অসুখটি সেকেন্ডারী পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সুযোগ পায়। এ সময় অল্প অল্প জ্বর থাকে। গলায় ব্যথা বা ক্ষত উপস্থিত হয়। মাথা ব্যথা, মাথা ভার বোধ করা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, মাংসপেশী বা সন্ধিতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতেও কিন্তু রোগটি সম্পর্কে অন্যের পক্ষে কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না। আস্তে আস্তে শরীরের অন্যান্য অংশে ভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অবস্থাটি ২/৩ বছর যাবত বিরাজ করতে পারে। কখনো কখনো তা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে।

প্রাইমারী স্টেজ বা প্রাথমিক অবস্থা এবং সেকেন্ডারী স্টেজ বা দ্বিতীয় অবস্থা পর্যন্ত প্রকৃত রোগটি সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তি ধারণা করার সুযোগ পায় না। গোপন রোগটিকে গোপন রাখার জন্য এটি এক উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু তারপর আসে টারসিয়ারী স্টেজ বা তৃতীয় অবস্থা। দু'চার বছরের ভিতর রোগটির চিকিৎসা না হলে ধীরে ধীরে তৃতীয় অবস্থা এসে উপস্থিত হয়। এ সময় উপদংশের ক্ষত দূষিত ও গলিত হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। ক্রমে অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। নাকের নরম হাড় (কার্টিলেজ) উপদংশের ঘায়ে আক্রান্ত হয়ে পচতে শুরু করে। এ সময়ে কানের নরম হাড় ও পাঁজরের নরম হাড়ও আক্রান্ত হয়। রোগটি আর গোপন থাকে না। প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে জনসাধারণের মাঝে নিজেকে পরিস্ফুট করে এবং পাপের ফসলকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলে। যৌনযন্ত্র উপদংশের ঘায়ে এভাবে আক্রান্ত হয় যে খসে পড়ার উপক্রম হয়। এ পর্যায়ে রোগটি কোষকলা, হাড়, জিহ্বা, জননাঙ্গ, লিভার প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকেও এটি ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উপদংশ একটি অপরাধজনক যৌন ব্যাধি। অবৈধ যৌন কর্মের অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রকৃতি উপদংশ ব্যাধি ছড়িয়ে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতিবাদীরা যাকে প্রকৃতি বলে আমরা তাকে প্রকৃতি বলে স্বীকার করি না।

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। এ সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য আল্লাহ পথ নির্দেশ করেছেন। এ পথ ত্যাগ করলে তার জন্য তিনিই নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাই উপদংশ প্রকৃতি প্রদত্ত শাস্তি নয়, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এক আযাব

বিশেষ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "আর ব্যভচারের ধারে কাছেও যেওনা; নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ কার্য। – সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩২ আয়াত

যেহেতু ব্যভিচার অশ্লীল ও মন্দ কাজ তাই তা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। ফলে আল্লাহ বলেছেন, আর ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেওনা। ব্যভিচারের কাছে গেলে উপদংশ রোগের যে শাস্তি প্রদত্ত হয় তার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত অন্যান্য শাস্তিরও সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়।

তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের জন্য পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকে ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মূহূর্তও বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করতে পারবেনা। – সূরা নাহল ঃ ৬১ আয়াত

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত । – সূরা ত্ব হা ঃ ১২৯ আয়াত

আল্লাহ আরও বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর নির্দিষ্ট কাল যখন হবে তখন অবকাশ দেয়া হবেনা; যদি তোমরা তা' জানতে। – সূরা নূহ ঃ ৪ আয়াত

কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তারা পাপে উন্নতি করতে পারে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। – সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮ আয়াত

একটি মাসআলা থেকে দেখা যায়, পাঁচটি অপরাধের জন্য কোরআনে হদ বা বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব শাস্তি কোন শাসক বা বিচারক ক্ষমা করতে পারে না। অন্যদিকে তওবা করলেও ক্ষমা হয়না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে এবং তার আচরণে যদি তওবার বিষয়টি নিশ্চিত করে, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। – তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন

কোরআনের উপরোক্ত আয়াত ও মাসআলা থেকে দেখা যায়, আল্লাহ অপরাধের শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পার হয়ে গেলে তওবা কবুল করা হয় না এবং শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। উপদংশ

রোগ অপরাধজনক যৌন কাজের ফলে উদ্গত হয়। যেহেতু তা গোপন অবৈধ কর্মের ফসল, তাই তা থেকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে থাকেন। উপদংশ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় যৌনাঙ্গে যে ফুস্কুরী দেখা দেয় তাতে কোন ব্যথা-বেদনা বা উপদ্রব সৃষ্টি না হওয়ার সুযোগ দিয়ে অপরাধীকে তার অপরাধ গোপন রাখার এবং অপরাধ ত্যাগ করার অবকাশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে অপরাধী অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ ত্যাগের দিকে ফিরে না গেলে উপদংশের দ্বিতীয় পর্যায় আসে। এ সময় তাকে কিছু শারীরিক কষ্টের সম্মুখীন করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত রোগ ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গটি তখনও গোপন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। তারপরও যৌন অপরাধী ঠিক পথে ফিরে না এলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে কঠোর শাস্তি। এর পরিণামে নাকের, কানের বা পাঁজরের নরম হাড়গুলো পচে যায় এবং খসে পড়ে। এতে নাক থ্যাবড়া বা গর্তযুক্ত হয়, কানের নিচের অংশ বা পুরো কান নষ্ট হয়, ফলে জনসমক্ষে তার পাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

দর্শনের দৃষ্টিতে উপদংশ রোগের প্রসারের ধারাবহিকতা লক্ষ্য করলে আল্লাহর নির্দেশিত শাস্তির ধারাবাহিকতার সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এতে অমুসলমানদের জন্য একটি সত্য প্রকট হারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, কোরআনের বাণী ও প্রকৃতি প্রদত্ত বলে যাকে বলা হয়, আল্লাহ প্রদত্ত সে শাস্তি একই সূত্রে গ্রথিত।

ফলে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কোরআন আল্লাহর বাণী এবং ইসলাম প্রকৃতই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। সামান্য একটি যৌনরোগ উপদংশ যেভাবে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে আরো যে কত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে তা খুঁজলে সত্যিই বিস্মিত হতে হবে। ফলে অমুসলমানদের কি সত্য ধর্ম ইসলাম থেকে আর মুখ ফিরিয়ে থাকার সুযোগ আছে?

- ❑ মাসিক মুঈনুল ইসলাম ঃ সেপ্টেম্বর '৯৭
- ❑ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ৬.৩.৯৮

বার্ধক্য ঃ কোরআনে ও বিজ্ঞানে

বার্ধক্য মানব জীবনের এক স্বাভাবিক পরিণতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

'আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। – সূরা রুম ঃ ৫৪ আয়াত

মানুষের জন্ম হয় দুর্বল ভিত্তির ওপর। এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন অপবিত্র ও নোংরা বীর্য থেকে তার জন্ম। আল্লাহ মহান রাব্বুল আলামীন এই নোংরা দুর্বল বীর্য ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে রূপদান করেন। অতঃপর তা থেকে উৎপন্ন করেন মাংসপেশী, মাংসের মধ্যে দেন অস্থি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করে মানুষকে শক্তির আধার হিসেবে পরিণত করেন। অতঃপর মানুষ শিশুকাল পেরিয়ে কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করে, তারপর ক্রমান্বয়ে দুর্বলতা প্রাপ্ত হতে থাকে এবং পদার্পণে করে বার্ধক্যে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । তারপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌছে যায় জ্বরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান।' – সূরা নাহল ঃ ৭০ আয়াত

মানুষের জন্মের সাথে মৃত্যুর ওতপ্রোত সম্পর্ক। কবির ভাষায়, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে' কথাটিতে আল্লাহর অমোঘ বিধানের সত্যতা

প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে আল্লাহর ইচ্ছায় আবার এক সময় তিনিই তাদেরকে মৃত্যুর হিমশীতল সুধা পান করান। তবে তাঁর ইচ্ছায় কেউ কেউ জ্বরাগ্রস্থ অকর্মন্য বয়সে পৌছে যায় বলে তিনি কোরআনে বিধৃত করেছেন। এখানে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মানুষের বার্ধক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ বার্ধক্যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভাষায়, যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। বার্ধক্যের প্রকৃত বয়স কোনটি এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে, কেউ ৯০ বছর বয়সকে বার্ধক্য বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ) ৭৫ বছর বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। –মাযহারী

বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়ায় সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়। ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেতে শুরু করে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এ বয়সের কবল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ, আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মন্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বার্ধক্য যে এই মন্দ বয়স বা অকর্মন্য বয়স তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বার্ধক্য এক অমোঘ বিধান। হাদীসে এসেছে, কেউ কেউ রসূলুল্লাহকে (সাঃ) প্রশ্ন করেন, আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে, কারণ আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ সেটি কোন রোগ? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য। – আবু দাউদ, কুরতুবী

মহান আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবু কি তারা বুঝে না।' – (সূরা ইয়াসিন ঃ ৬৮ আয়াত

প্রকৃতই মানুষের মাঝে কেউ কেউ বুঝতে চায়না যে, আল্লাহ্র বিধিবদ্ধ বিধান ডিঙ্গিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমুদয় মানুষ যদি মৃত্যুবরণ না করত তবে মানুষের পদভারে সমগ্র পৃথিবী হয়ে পড়ত বাসযোগ্যহীন। আর আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বজ্ঞ বলেই জ্বরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুকে পাশাপাশি বেঁধে দিয়েছেন।

মানুষ অত কিছু চিন্তা করেনা বলে কেউ কেউ বার্ধক্যকে জয় করার গবেষণায় মেতে ওঠেছেন। তাই তারা মনোমুগ্ধকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বার্ধক্য রোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী অগাস্ট ওয়েসম্যান বার্ধক্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রথম উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, প্রতিটি প্রাণীর সর্বোচ্চ জীবন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ। জাতি ও প্রজাতিভেদে এর মাঝে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই দেহের বিভিন্ন কোষ বা অঙ্গের মাঝেও এই পার্থক্য বিদ্যমান। একই রক্তের কোন কোষের আয়ুষ্কাল ১২০ দিন আবার কোন কোনটির আয়ুষ্কাল ১২০ ঘন্টাও দেখা যায় না। এই ভিন্নতার মাঝেই লুক্কায়িত রয়েছে বার্ধক্যের গোপন সূত্র।

১৯৬১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী জোরেস মেদভাদেভ উদ্ভাবন করেন যে বয়স্ক কোষের প্রতিটি প্রোটিনে বেশি মাত্রায় থাকে ভুল এমাইনো এসিড। এই এসিডগুলো কোষের মূল অংশ হিসেবে বিবেচিত। ডি এন এ, আর এন এ, প্রোটিন এবং প্রোটিন সেনথেসিস বয়স্ক কোষে সঠিকভাবে বিন্যস্ত নয়। যে কোষে এগুলোর বিন্যাস যত সঠিক হবে সেই কোষটি হবে তত দীর্ঘায়ু। যদি কোনভাবে ডিএনএ, আরএনএ এবং প্রোটিনের সমন্বয় ভুলভাবে সংযোজিত হয় তাহলে কোষটির জীবনচক্র হবে কম। এই ভুল সমন্বয়ের কাজটি যদি শুধরে দেয়া যায় তবে কোষের জীবনচক্র বেড়ে যেতে পারে এবং ফলে মানুষের বার্ধক্য রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

এসব তথ্য সবই সম্ভাবনার। প্রকৃতপক্ষে বার্ধক্য রোধ করা সম্ভব হবে কি?

একজন গ্রীক বিজ্ঞানী ১৯২২ সালে বয়স রঞ্জক হিসাবে ধারণা দেন লাইপোফোসিন-এর। লাইপো অর্থ ফ্যাট বা চর্বি এবং ফোসিন বলতে বোঝায় নোংরা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন বস্তু। স্নায়ুকোষে এর উপস্থিতি থাকে। স্নায়ুকোষ নিজে বিভাজিত হয় না কিন্তু এই লাইপোফোসিন বিভাজিত হয়। ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে লাইপোফোসিনের পরিমাণে তারতম্য ঘটে। চর্বি, শর্করা ও আমিষের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইপোফোসিনের তারতম্যের কারণে কোষের আয়ু কমে যায়, ফলে বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়। ভিটামিন ই লাইপোফোসিনের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে আর এতে করে স্বাভাবিকের চাইতে বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

হেক্লিক নামের এক বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় জানা সম্ভব হয়েছে, মানুষ, স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহ, পাখি এবং সরীসৃপভুক্ত প্রাণীর ফাইব্রোব্লাস্টের জীবনচক্র

নির্ণয় করা হয় সময়ের সংখ্যা দিয়ে। কতক্ষণে কোষ বিভাজন সম্পূর্ণ হয় এবং দ্বিগুণ হয় সেই সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হয়। এ ধরনের 'পপুলেশন ডাবলিং' কে (PD) বলা হয় হেফ্লিক লিমিট। মানুষের ক্ষেত্রে হেফ্লিক লিমিট ৫০ ± ১০ পিডি। অর্থাৎ. মানুষের ফ্রাইব্রোব্লাস্ট যদি প্রতি ১ বছরে দ্বিগুণ এবং সম্পূর্ণ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি ৪০ থেকে ৬০ বছর বাঁচতে সক্ষম হবে। ফাইব্রোব্লাস্ট বিভাজনের সময় আরো বেশি প্রয়োজন হলে আয়ু সেই অনুপাতে বেশি হবে।

মানুষ কি সত্যিই বার্ধক্য রোধ করতে সক্ষম হবে? মানুষ যদি ৩০০ বছর বাঁচে তবে একটানা ১০০ বছর শিক্ষাজীবন, ১০০ বছর কর্ম জীবন এবং ১০০ বছর অবসর জীবন যাপন করতে পারবে। এ কি এক দুঃসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না? বিষয়টি কল্পনা করতেও অস্বস্তিই অনুভব হয়। বর্তমানে যারা একশত বছরের চাইতে বেশি বয়স বাঁচেন তাদের অধিকাংশের জীবনে যে বিড়ম্বনা লক্ষ্য করা যায় তার ফলাফল দেখে কেউ আর বেশি বছর বাঁচতে চাইবে? বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখার চিন্তা যারা করেন তাঁরা সত্যিই কি তা করতে সক্ষম হবেন? বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, আয়ু বৃদ্ধি না করে বৃদ্ধাবস্থাটাকে অবলুপ্ত করার কথা। এটিও সম্ভব হবে কি না তা ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।' – সূরা রুম ঃ ৫৪ আয়াত

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়ে যারা সন্দেহ পোষণ করে গবেষণা করে বার্ধক্য প্রতিরোধ করতে চান তার বোকার স্বর্গে বাস করেন।

❑ মাসিক আত, তাওহীদ ঃ মার্চ-এপ্রিল '৯৭

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঃ বিজ্ঞানের আলোকে

আমার একটি শিশু-সন্তানকে হাতে খড়ি দেয়ার সময়ে অ আ ই ঈ অক্ষরগুলো এমনভাবে চিনতে সাহায্য করা হল যে, সে যে কোন বাংলা বই থেকে দেখে দেখে অক্ষরগুলো পৃথকভাবে পড়তে পারে। হঠাৎ একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলঃ আব্বু, আপনি এগুলো পড়তে পারেন?

বাংলা ভাষায় অক্ষরের সংখ্যা যে মাত্র চারটি নয়, তা শিশুটি তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। বাংলা ভাষায় বাকী অক্ষরগুলো চিনে নিয়ে তাকে যে শব্দ ও বাক্য তৈরি করতে হবে তাও সে অনুধাবন করতে পারেনি। পুরো বাংলা ভাষাটাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে তাকে যে বাংলা ব্যাকরণের কঠিন মাঠে বিচরণ করতে হবে, তাও সে আন্দাজ করতে পারেনি। বাংলা ভাষার সাহিত্য ছাড়াও অনেক বিষয়ের বিশাল সমুদ্রে যে তাকে সাঁতার কাটতে হবে, এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই তৈরী হয়নি। সে বুঝেছে, সে এখন বই পড়তে পারে। চারটি বর্ণ পড়তে পারা যে বই পড়তে পারা নয়, তা কি তার মগজে সে সময়ে ঢোকানো সম্ভব? আর সম্ভব নয় বলেই তার মগজ আন্দাজ করতে পারেনি- তার আব্বা কতটুকু পড়তে পারেন। তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সন্দেহ জেগেছে, সে যা পড়তে পারে তা বোধ হয় তার আব্বা পারেন না।

সারা পৃথিবী জুড়েই নাস্তিক্যবাদ দুর্বার গতিতে প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মস্তিষ্ককে শিশুদের মন-মস্তিষ্কের মত এভাবে বিবেকহীন করে দিচ্ছে। আল্লাহর এই বিশাল বিশ্বের হাজার হাজার নেয়ামতের মাঝে বিচরণ করেও শিশুর মত কেউ কেউ প্রশ্ন করে বসেছে, মানুষ মরে পচে-গলে গেলে তাদেরকে হাশরের দিন আল্লাহ কিভাবে পৃথক করবেন? (নাউজুবিল্লাহ)

মানুষের ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা আল্লাহর বিশাল তথা সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপারে সামান্যতম ধারণাও করতে পারছে না। তাদের জন্য সত্যিই করুণা হয়। বিশ্বের আঠারো হাজার মাখলুকের মাঝে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে মানুষকে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছে। জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধির প্রধান পরিচালন কেন্দ্র হচ্ছে ব্রেন। ব্রেন একটি জটিল অঙ্গ। কম্পিউটারের সাথে তুলনা করলে ব্রেনের ক্ষমতার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। আধুনিক কম্পিউটার যেখানে ১০০ বিলিয়ন বিট-তথ্য জমা ও মনে

করতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্রেনের সামর্থ অসীম। জার্মানীর বিখ্যাত ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ম্যানফ্রেড ইগান পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ব্রেনের কোন ক্যামিক্যাল রিএকশন সংঘটিত হতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। তিনি বলেছেন, একটি দ্রুতগামী গাড়ির নিচে চাপা পড়াকালে এক পা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে ও তা দ্রুত কার্যকরী করতে ব্রেনের এক লক্ষ নিউরনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সময় ব্যয় হয় এক সেকেণ্ডেরও কম। ব্রেন যে এত কাজ করতে সক্ষম সেখানেও মানুষ মাত্র ব্রেনের ৪ থেকে ৫ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান বলে যাদেরকে গণ্য করা হয় তারা ব্রেনের এই অসীম ক্ষমতার মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। মানুষ তার ঘাড়ে বহন করে বেড়ায় মাথার ভিতরে সেই ব্রেন। সেই ব্রেনের শতকরা ১৫ ভাগ ব্যবহার করলেও আরো শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষমতা মানুষ আজো ব্যবহার করতে পারছে না। আল্লাহ প্রদত্ত ব্রেনের ক্ষমতার শতকরা ৮৫ ভাগ ব্যবহার করতে অক্ষম হয়ে মাত্র ১৫ ভাগ ব্যবহার করতে পেরেই কোন কোন মানুষ আল্লাহর অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে দ্বিধা করছে না। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নকারীদের মাঝে শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ ব্রেনের ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যাধিক্যই পরিলক্ষিত হবে। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এম, এস, সি'র অংক আদৌ বুঝতে সক্ষম হবে কিনা সে ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকলেও আল্লাহর অসীম কুদরতের কথা ব্রেনের শতকরা ৪ ভাগ ব্যবহারকারী কিভাবে বুঝতে চায় তা বোধগম্য নয়।

চিলির রাজধানী লা প্লাটা শহরের ঘটনা। এক মহিলার দু'টো সৎ ছেলে ছিল। তাদেরকে সে মোটেই সহ্য করতে পারতোনা। একদিন সে সুযোগ বুঝে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে দু'টো ছেলেকে খুন করে বাগানে ফেলে রাখে। পুলিশ এলে সে হাউ মাউ কান্না জুড়ে দিয়ে প্রতিবেশী এক মহিলাকে খুনের জন্য দায়ি করে। পুলিশ অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে; কিন্তু সন্দেহবশতঃ সৎ মায়ের হাতের ছাপ নিয়ে নেয়। সারা বাড়ি ঘুরে পুলিশ ঘরের চারদিকে ইতস্ততঃ রক্তের দাগ দেখতে পায়। ঘরের দরজাতেও রক্তের ছিট ছিল। রক্তলাগা দরজার অংশ পুলিশের হেফাজতে নিয়ে গিয়ে দরজায় লাগা হাতের ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেল, সৎ মায়ের হাতের ছাপের সাথে তার মিল রয়েছে। পুলিশের ধারণা হয়, সন্তানদেরকে বাড়িতে হত্যা করে মহিলা মৃতদেহ বাগানে ফেলে এসেছে। তারপর সৎমাকে গ্রেফতার করে জেরা করার পর সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে,

সেই খুন করেছে। হাত বা আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে অপরাধী সনাক্ত করার আইন পাস হওয়ার পর এটি ছিল প্রথম ঘটনা। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে অপরাধী সনাক্তকরণের আইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে যত মানুষই থাকুক না কেন তাদের একজনের আঙ্গুলের ছাপের সাথে অন্য আর একজন কেন, অন্য কারো আঙ্গুলের ছাপের মিল নেই। টোকিওর সুজুকি হাসপাতালে কর্মরত জনৈক চিকিৎসক ১৮৮০ সালে ইংরেজী 'নেচার' পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ একেবারেই তার নিজস্ব। অন্য কোন মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই।

তাছাড়াও হাতের ছাপ (পাঞ্জা), পায়ের আঙ্গুলের ছাপ, পায়ের ছাপ সবগুলোই প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা আলাদা। আর এই যে পৃথকীকরণ পদ্ধতি– আল্লাহ যা মানুষের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন– তার উপর নির্ভর করে পুলিশ আসামীকে সনাক্ত করে ফেলে। কোটি কোটি মানুষের ভেতর থেকে একজন আসামীকে পৃথক করতে পুলিশের যেখানে অসুবিধা হয় না সেখানে হাশরের দিন আল্লাহর কেন অসুবিধা হবে? (নাউজুবিল্লাহ)। আল্লাহর কাছে কি এর চাইতেও অসংখ্য গুণ বেশি পৃথকীকরণ ফর্মুলা মওজুদ থাকতে পারে না ঃ

মানুষের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে জিন, প্রাণ রসায়নের পরিভাষায় যার নাম ডি, এন, এ (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)। মানব শরীর অসংখ্য জীবন্ত কোষের সমন্বয়ে গঠিত। সব জীবন্ত কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া সুক্ষ্ম সুতার মত বস্তু বা ক্রমোজম থাকে। এই ক্রমোজমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্পিলাকারে প্যাঁচানো থাকে দুই কুণ্ডলীযুক্ত ডি. এন. এর আণবিক শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলের এক একটি অংশ কাজ করে এক একটি জিনের।

মানব দেহে প্রায় ৫০ ট্রিলিয়ন (এক মিলিয়নের ঘনফল) কোষ রয়েছে। প্রতিটি জীবিত এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে আছে ৫ পিকোগ্রাম বা $১০^{-১২}$ গ্রাম বা এক গ্রামের এক মিলিয়ন অংশের এক মিলিয়ন অংশ। গাণিতিক হিসেবে ডি. এন. এর মোট পরিমাণ ২৫০ গ্রামের মত। যদি শরীরের সমুদয় ডি. এন. এ-কে বের করে পর পর জুড়ে দেয়া যায়, তবে তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় নয় গুণ দূরত্ব অতিক্রম করবে। পৃথিবীতে থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল বা ১৫ কোটি কিলোমিটার।

ডি. এন. এ-র আণবিক শৃঙ্খলটি অসংখ্য মৌলিক উপাদান বা নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে তৈরি। প্রতিটি নিউক্লিয়োটাইডে রয়েছে ক. এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন– এই চারটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস, খ. প্যান্টোজ (পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা), ডি অক্সিরাইবোজ এবং গ. ফসফরিক এসিড। ডি. এন. এ-র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে নিউক্লিয়োটাইডগুলোর উপর, সঠিকভাবে বলতে গেলে ওই নাইট্রোজেনগঠিত বেস চারটির সজ্জা রীতির উপর। মানবদেহের কোন কোষের নিউক্লিয়াস থেকে ডি. এন. এ বের করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিলে বিভিন্ন মাপ ও ওজনের জিন পাওয়া যায়। এই জিনের অদৃশ্য অংশগুলোতে তেজস্ক্রিয় স্টিকার (ডি. এন. এ প্রোব) লাগিয়ে নিলে দৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব হয়। শেষ ধাপে এক্সরে ছবি তুললে প্লেটে ওই স্টিকারগুলো গাঢ় চওড়া পট্টির মত দাগ ফেলে। স্টিকারগুলো যেখানে সেখানে আটকে না গিয়ে ডি. এন. এ শৃঙ্খলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে এঁটে বসে। এখানেই ধরা পড়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। সদৃশ যমজ ছাড়া যে কোন দু'জন মানুষের স্টিকার আটকাবার জায়গাগুলো আলাদা হবেই। ফলে পৃথিবীর সমুদয় মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ডি. এন. এ পরীক্ষায় পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। এ পদ্ধতির নাম ডি. এন. এ ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতি। প্রতিটি কোষের ডি.এন. এ তে থাকে ছ'বিলিয়ন (ছ' হাজার মিলিয়ন) নিউক্লিয়োটাইড। দু'জন মানুষের ডি. এন. এ তে এগুলো একই শৃঙ্খলে সাজানো থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তাই পৃথিবীর সমুদয় মানুষকে যদি একত্র করেও গুলিয়ে ফেলা যায় ডি. এন. এ ফিঙ্গার প্রিন্ট পরীক্ষায় প্রতিটি মানুষকে পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব।

মৃত প্রাণীর ডি. এন. এ থেকে জীবন্ত প্রাণীর জন্ম দেয়া সম্ভব বলে জনৈক জাপানী বিজ্ঞানী কাজুফুমি গোতো মত প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯৯০ সালে একটি মরা গরুর শুক্রাণু থেকে ডি.এন. এ পৃথক করে নিয়ে টেস্টটিউবে একটি গাভীর তাজা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করেছিলেন এবং সেই নিষিক্ত ডিম্বাণু জীবন্ত গাভীর জরায়ুতে স্থাপন করে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক বাছুর প্রসব হতে দেখেছিলেন। এ গবেষণার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে তিনি ১৯৯৭ সালে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে ম্যামথ নামক প্রাণীর জীবাশ্ম সংগ্রহ করতে চাইছিলেন হাতির আরেক গোষ্ঠী– যাদের গায়ে লোম ছিল– তাদেরকে বলা হয় ম্যামথ। ১০ হাজার বছর আগে ম্যামথ পৃথিবী থেকে ঝাড়ে-বংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গোতো আশা করছিলেন ম্যামথের জীবাশ্ম পাওয়া গেলে তার শুক্রকীটের কোষ থেকে ডি. এন. এ সংগ্রহ করে তার মাধ্যমে জীবন্ত হাতির ডিম্বাণু নিষিক্ত করে

শংকর প্রাণী পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে 'মেন্ডেলস্ ল অব জেনেটিকস' নীতির উপর নির্ভর করে ম্যামথেরও দেখা পাওয়া যেতে পারে। এ গবেষণার পরবর্তী রিপোর্ট আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ব্রেনের শতকরা ৪ থেকে ১৫ ভাগ ব্যবহার করে মানবের পৃথকীকরণ ফর্মুলা আবিষ্কার করে নিয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানভাণ্ডারের যথসামান্য অংশ ব্যবহার করে মৃতপ্রাণী থেকে জীবন্ত প্রাণী পাওয়ার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে কিছুটা সফলতাও এসেছে। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, শতকরা একশত ভাগ আল্লাহ প্রদত্ত ব্রেন যে মানুষ আজও ব্যবহার করতে পারছে না, সে মানুষ কিভাবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা নিয়ে ভাববার দুঃসাহস দেখায়! সে মানুষ কিভাবে ভাবতে পারে, হাশরের দিন আল্লাহ মৃত মানুষকে কিভাবে পৃথক করবেন? আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার আশ্রয়ে হেফাজত করুন। আমীন।

❑ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ৫ মার্চ '৯৭

সমাপ্ত